এশিয়ার সেরা লোককাহিনী

নিমাই দাস

ডেল্টা ফার্মা
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশিকা ঃ
স্বপন সাহা
ডেল্টা ফার্মা
৬ নং, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

এশিয়ার সেরা লোককাহিনী
Collection of best Folk tales of Asia
by Nimai Das

প্রথম প্রকাশ ঃ
বইমেলা
১৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৭

মূল্য ঃ আঠার টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ—সহরলাল সাহা
প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ অনু জব সেণ্টার
কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রণ ঃ
শ্রী কমল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া
২১/২এ, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

দু-একটি কথা

লোককাহিনী কোন নতুন কাহিনী নয়। আমাদের দেশে গ্রামে-গঞ্জে বহু লোককাহিনী ছড়িয়ে আছে। তার অনেক কথা আমাদের জানা। অনেক অজানাও। কিন্তু দেশের সীমারেখা পেরিয়ে এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভু-খণ্ডে নানা জাতির, নানা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে আছে বহু বিচিত্র লোককাহিনী। তার সব কথা কিশোরদের উপযোগীও নয়। তাই বিভিন্ন দেশের কিছু কাহিনী সংকলন করে কিশোরদের মনের উপযোগী করে তুলে ধরলাম। তাদের মনের কল্পলোকে এসব কাহিনী আনন্দের অমৃত ধারা বইয়ে দিলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

নিমাই দাস

১০৭, বিধান নগর রোড, কলি.—৬৭

১৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৭

সূচীপত্র

প্রিয় কিশোর পাঠকদের হাতে তুলে দিলাম।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :—

মোনালিসা (গল্পগ্রন্থ)
পোস্টার (কবিতা)
মিছিল (গল্পগ্রন্থ)
কেতকীর স্বপ্ন-বিলাস (উপন্যাস)
বিশ্বের সেরা লোককাহিনী
নাসিরউদ্দিন যুগ যুগ জীয়ো
পশুপালক
হাঙ্গেরীর লোককাহিনী (যন্ত্রস্থ)
তিনকন্যা (যন্ত্রস্থ)

এশিয়ার সেরা লোককাহিনী

পশ্চিমে দিবাকর অস্ত যায়। তার লাল রঙের ছটায় পাহাড়ের কোল
ালো হয়ে ওঠে। গাছপালায় লালের ছোপ ধরে আর পূব থেকে পশ্চিম
ামানা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা পাহাড় শ্রেণীর মাথার ওপর সাদা চূড়োয় সোনার
জ্জলতা দেখা যায়। পাহাড়ের কোলে শান্ত মেয়ের মত চুপটি করে বসে বিস্তীর্ণ
। তার নীল জল বিদায়ী সূর্যের আলোয় ঝলমল করে ওঠে।

সেখানকার রূপে মন জুড়োয়। বাতাসে গান ভাসে। আর পাহাড়ের

কোলে যারা বাস করে, সেই আদিবাসীদের কথায়, নাচেগানে, হৈ-হুল্লোড়ে প্রাণ ভরে যায়।

সি তালাং ওই পাহাড়ের কোলেই থাকতো। আর থাকতো তার বউ দেরুম। ওদের চোখের মণি, প্রাণের ধন একমাত্র ছেলে। নাম তার সি তাংগাং।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়।
গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত যায়। আসে। যায়।
সি তাংগাঙের কচি শরীর বড়ো হয়।

সে বড়ো হয়। পড়শীর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সেও বেরিয়ে পড়ে খেলতে, আমোদ করতে। পাহাড়ের ঢালে কিংবা পাহাড়ী জংলায় পশুশিকার করতে যায়। আমোদ ও হয়। খাবার ও জোটে। আবার কখনও দল বেঁধে হৈ হৈ করে দহের জলে নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে মাছ শিকারে।

একদিন সি তাংগাং একা একা বেরিয়ে পড়লো। সঙ্গে নিলো তার প্রিয় নৌকাখানা। দহের নীলজল তির্ তির্ করছে। মিষ্টি হাওয়া বইছে, মাথার ওপর নীল চাঁদোয়ার মত আকাশ। দুষ্টু শিশুর মত সাদা সাদা মেঘের পাল হাওয়ায় মাতামাতি কারে ছুটোছুটি করছে। দাপাদাপি করছে।

সি তাংগাং অবাক চোখে এসব দেখতে দেখতে নৌকা বেয়ে এগিয়ে চলে। সে জানতেই পারে না, কখন তার নৌকাখানা দহ পেরিয়ে দরিয়ার মোহনায়। বড় বড় ঢেউ তোলা সাগর যেন দরিয়াকে গিলতে চাইছে।

দরিয়ার মুখেই একটা জাহাজ নোঙর করেছিল। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে কাপ্তেন তাংগাংকে লক্ষ্য করছিল অনেকক্ষণ ধরে। একবার ইঙ্গিত করলো কী একটা। সঙ্গে সঙ্গে তিনজন লোক এসে হাজির হলো তার কাছে।

কাপ্তেন নৌকাটাকে দেখিয়ে বললো, ছোঁড়াটাকে ধরে নিয়ে এসো।

কাপ্তেনের মুখের কথা থামতে না থামতেই জনা কয়েক নাবিক একটা ছোট নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো তাংগাংকে ধরে আনার জন্যে।

অনায়াসে ওরা ধরে ফেললো তাকে। ওদের জাহাজ সাগরে পাড়ি দিল। সি তাংগাং হারালো তার মাকে, বাবাকে, আর সাদা চূড়োর সেই পাহাড় আর সবুজ বনানীকে।

সাগরের লোনা জলে তার শরীর খারাপ করলো। ভক্ ভক্ করে বমি

করতে লাগলো। মনে পড়তে লাগলো খেলুড়িদের কথা। মায়ের কথা। হ্রদের নীল তিরতিরে জলের কথা। রূপোলী মাছ, আর বনের পালিয়ে বেড়ানো অবোধ পশুদের কথা।

দিন বয়ে যায়। লোনজলে ওর গা-সহা হয়। আগের মত আর শরীর খারাপ করে না। গা-বমি বমি করে না। একটু আরাম বোধ করতে থাকে।

এবার জাহাজের নাবিকরা ওকে নানারকম কাজ করতে দেয়। বড়ো আর ভারী কাজ। সি তাংগাং কাজকে ভয় পায় না। যে কাজই ওর ওপর চাপিয়ে দেয়, সেটাই সে যত্ন নিয়ে করে, সময় মতো করে। সবাই ওর কাজের আর নিষ্ঠার তারিফ করে। আর কী অমায়িক তার ব্যবহার। জাহাজের কোনো নাবিকের সঙ্গে ঝগড়া করে না। মারামারি করে না। বরং সবাইকে ভালবাসে। সমীহ করে। মান্যি করে।

জাহাজের কাপ্তেনের এসব দেখে ভারী ভালো লাগে। ভাবে, নাঃ। ছেলেটা, পাজী শয়তান নয়। ভারী সুন্দর ওর স্বভাব।

একদিন জাহাজ ফিরলো নিজের দেশে। কাপ্তেন সি তাংগাংকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরলো।

কাপ্তেনের বৌয়ের কোন ছেলেপুলে ছিল না। কাপ্তেন তাকে বুঝিয়ে বললো, ছেলেটি ভারী ভালো। যেমন মিষ্টি স্বভাব, তেমনি কাজের ছেলে। আমার ভারী ইচ্ছে ছেলেটাকে দত্তক নিই। তুমি কী বলো?

এই বলে কাপ্তেন তার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

বউটি বললো, ওমা। এতে আমার আপত্তি হবে কেন? আমাদের ছেলে নেই, পুলে নেই, এমন সুন্দর একটা সোমত্ত ছেলে পাবো, এতো আমার আনন্দের।

বউটি ভারী খুশি হলো।

কাপ্তেনও খুশি হলো।

ওদের ঘরে আনন্দের জোয়ার এলো।

সি তাংগাং ওদের সন্তান হয়ে গেলো।

ওকে সুগন্ধি জলে স্নান করানো হলো। দামী দামী পোশাক পরানো হলো। হাড়ী ছেলে সি তাংগাং এখন সুঠাম, সুন্দর, চটপটে সভ্য ছেলে হলো।

এখন সি তাংগাং বাপের সঙ্গে জাহাজে বেরিয়ে পড়ে নানান দেশে। কাপ্তেনের কাজে সে সাহায্য করে। কাজ শেখে। দক্ষতা বাড়ে তার কাজে। কাপ্তেনের ভরসা বাড়ে ছেলের কাজে।

একদিন কথায় কথায় কাপ্তেনের ছেলের কথা ওঠে জাহাজের মালিকের কাছে। কাপ্তেন নিজেই সে কথা পাড়ে। জাহাজের মালিক হলেন বণিক। অগাধ সম্পত্তি তার। কিন্তু মনটা তার ভালো।

একটা ছুতো করে বণিক-গিন্নি কাপ্তেনের বাড়ি এসে সি তাং গাংকে দেখে গেল। ভারী পছন্দ হলোতার। তারপর দিনক্ষণ দেখে বণিকের মেয়ের সঙ্গে কাপ্তেনের ছেলের বিয়ে হয়ে গেল।

এখন সি তাংগাঙের নতুন নাম হলো নাকোদা তাংগাং।

দিন যায়। বয়েস বাড়ে কাপ্তেনের। জাহাজের চাকরী থেকে একদিন কাপ্তেনকে অবসর নিতে হলো। বণিক এবার জামাইকে জাহাজের কাপ্তেন করে নিলেন। তার কাঁধে এসে পড়লো জাহাজের সমস্ত দায়িত্ব। যোগ্যতার সঙ্গে তাংগাং বাণিজ্য করতে লাগলো। ব্যবসার পরিমাণ যেমন বাড়লো, লাভের পরিমাণ ও তেমনি বাড়লো।

দেশের রাজা বাণিজ্য-বৃদ্ধির খবরে খুশি হয়ে একদিন তাংগাংকে নেমন্তন্ন করে পাঠালেন তার প্রাসাদে।

তাংগাঙের খুশি আর ধরেনা। বুড়ো কাপ্তেন আর বুড়ী-মা ছেলের খ্যাতির আনন্দে ডগমগ করতে থাকে। তাংগাং দামীদামী আর ঝলমলে পোশাক পরে প্রস্তুত হয়ে নিলো।

এদিকে রাজপ্রসাদও তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত হয়েছে। প্রাসাদের দরবার হল সাজানো হয়েছে নানান আলোয়। নানান ফুলের গন্ধে চারিদিক ম-ম করছে। রাজা বসে আছেন বর্ণাঢ্য পোশাকে। রাণী সেজেছেন ঝলমলে গয়নায়। আর তাঁর পাশে ঝরণার নীল জলের মত স্বচ্ছ নীলাভ পোশাকে সোনার বরণ শরীরটাকে ঘিরে রেখেছেন রাজ কুমারী। চোখে টানা টানা কাজলরেখা। মাথায় হালকা বাদামী রঙের পশমের মত নরম চুল মুখের চেহারাকে একটা আলাদা রকমের শ্রী এনে দিয়েছে। গায়ে গয়নার জমক তেমন কিছু নেই। শুধু সাত ছড়া হার জানু পর্যন্ত গড়িয়ে এসেছে। তাতে আছে হীরা মুক্তো আর মণির রং বাহার।

ওদের দু'পাশ ঘিরে দুই সারিতে রাজসভার মান্যগণ্য সদস্যরা বসে রয়েছেন। বসে আছেন প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও অন্যান্য অনেক মন্ত্রী।

নাকোদা তাংগাং প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে রাজা উঠে তাকে আপ্যায়ন করলেন। অর্থ ও বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

নাকোদা তাংগাঙের চেহারায় রঙের জৌলুষ ছিল না। কিন্তু ছিল পুরুষের কাঠিন্য, ঋজুতা আর বলিষ্ঠতা। দীর্ঘ-দেহী নাকোদার ব্যক্তিত্বপূর্ণ উপস্থিতিকে দু'চোখভরে দেখলো রাজকুমারী। অপলক তার দৃষ্টি।

নাকোদাও দেখলো তাকে। নীল জলে ভাসমান একখানি সোনার পদ্ম। তারও দৃষ্টি পলকহীন। পরমাশ্চর্যকে যেন দুজনেই খুঁজে পেয়েছে বহুদিন পরে।

প্রথম দর্শনের এই স্মৃতি নাকোদা তাংগাঙের মন থেকে সহজে মুছে যায়নি। যথোচিত সম্মান, পুরস্কার ও ভোজনের পর নাকোদা বাড়ি ফিরে গিয়েছিলো।

কাজের মানুষ বেরিয়ে পড়লো কাজে। বাণিজ্যের সম্ভার নিয়ে বিশাল জাহাজ নীল সাগরের ওপর দিয়ে চলতে লাগলো দেশে দেশান্তরে। সব পণ্য বিকিয়ে গেলো। প্রচুর অর্থাগম হলো। সস্তাদামে অনেক পণ্য নিয়ে ফিরলো নিজের দেশে। বণিক খুশি হলেন। নাকোদার স্ত্রী খুশি হলো। নাকোদার পালক বাবা-মা ছেলের বাণিজ্য সাফল্যে আনন্দিত হলো, গর্বিত হলো। দেশে নাকোদার নাম উজ্জ্বল হলো।

রাজা খুশি হয়ে নাকোদার সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে দিয়ে দিলেন। নাকোদা তাংগাং এতদিন পরে কাছে পেল তার স্বপ্নের ধন। নীল জলে ভাসমান সোনার পদ্ম। রাজকুমারী।

কিন্তু গোলাপে যেমন সৌন্দর্য আছে, তেমনই কাঁটা আছে, আবার অগাধ সুখ আর সম্পদেও আছে দুঃখের কারণ। বেদনার উৎস। জীবনটাই এই রকম। একটানা উত্থান কারো ভাগ্যে ঘটে না। ঘটলেও তাতে পতনের সম্ভাবনা থেকেই যায়।

রাজার জামাই নাকোদা তাংগাং। সুখের নরম বিছানায় যার নিত্য ঘুম, ফুলের গন্ধে যার ঘর আমোদিত, রত্নের পাহাড় যার ঘরে, তার আবার দুঃখের কী! নাকোদা এসব ভাবতেই পারে না। স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি সে বণিক কন্যা আর রাজকুমারী একঠাঁই থাকতে পারে না। ওরা যে সতীন। প্রায়ই ওদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি লেগে থাকে। ঘরে ফিরে নাকোদা তাংগাঙের একটুও

ভালো লাগে না। কারোর ভালবাসাই সে পায় না। জীবনটা তার বিষময় হয়ে ওঠে।

একদিন ঠিক করলো দুই বউকেই সে বাণিজ্যযাত্রায় নিয়ে যাবে। হয়ত বাইরে বেরিয়ে ওদের মনটা ভালো হবে। দুজনে ভাবসাব হবে। নাকোদা তাদের জানালো তার মনের ইচ্ছা। দুই বউই কোনো ওজর-আপত্তি না তুলে রাজী হয়ে গেলো।

নাকোদা জাহাজের ছুতোর মিস্ত্রিদের হুকুম দিলেন রাণীদের জন্যে আলাদা আলাদা কেবিন বানাতে। মিস্ত্রি নানারকম নকৃশা করা সাজানো কেবিন বানিয়ে ফেললো। রং ধরানো হলো। পালিশ করা হলো। রাণীর থাকার ঘর! যত্নের শেষ নেই যেন! নাকোদা তাংগাং নিজে তদারক করলেন। দুই বউ একদিন ঘটা করে দেখে গেল।

দিনক্ষণ দেখে একদিন জাহাজ রওনা দিলো। বুড়ো কাপ্তেন আর তার বুড়ীবউ জাহাজঘাটায় এসে শুভবিদায় জানালো। বণিক আর বণিকের বউ এলো—তারাও আশীর্বাদ করলো। সবশেষে জাঁকজমক করে রাজা এলেন। রাণী এলেন। তাদের দেখবার জন্যে পিঁপড়ের সারির মত লোক জুটলো দলে দলে।

রাজা রাণী দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। রাণী এগিয়ে এসে রাজকন্যার কপালে চুম্বন এঁকে দিলেন।

হুইস্‌ল বাজলো—ফর্‌-র্‌-র্‌-র্‌…

পতাকা ওড়ানো হলো।

বিশাল জাহাজ আর বিশাল দেহখানা দুলিয়ে কাঁপিয়ে জলে ঢেউ তুলে এগিয়ে চলতে লাগলো।

জাহাজঘাটায় জয়ধ্বনি উঠলো।

ক্রমে জাহাজ দেশের সীমানা পেরিয়ে চললো। অনন্ত জলরাশি চারিদিকে নীলের ঢেউ তুলেছে। আকাশের আশমানী নীলে নানা রঙের মেঘের খেলা। সাদা সাদা টুকরো মেঘের কোণ ঘেঁষে সোনার ঝিকিমিকি, কখনও বা তার মাথায় চূড়োর কোল জুড়ে নীলের উজ্জ্বলতা। কখন নীল সাগরের ওপরে বাদল ঘন।

কিন্তু কোথাও ডাঙা নেই। বিশ্ব থেকে সব ডাঙা কেউ কোথাও

লুকিয়ে রেখেছে। বণিককন্যা আর রাজকন্যা আকাশের বিচিত্র মেঘ, সাগরের নীলজল দেখতে দেখতে হাঁপিয়ে উঠেছে। বণিককন্যা রাজকন্যার কাছে এসে জানায়, আর ভালো লাগে না ভাই। এ বড়ো একঘেঁয়ে জীবন।

রাজকন্যা সায় দেয় তার কথায়।

দুজনে সমব্যথী হয়।

দেখতে দেখতে ওরা এসে পড়ে প্রবাল দ্বীপে। দুই বউ মনের আনন্দে প্রবাল কুড়োয়। সাগরের ঢেউ এর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়। খল খল করে হেসে ওঠে। কখনও দুজনায় গলা জড়াজড়ি করে দুই সখির মত গুন গুন করে গান গায়। কানে কানে ফিস ফিস করে কথা বলে। দুজনের দ্বেষ, ঈর্ষা কোথায় হারিয়ে যায়।

এদিকে আকাশ জুড়ে কালো মেঘের হানাদারি শুরু হয়ে গেছে। বাতাস বইছে না। নাবিকের দল ত্রস্ত। বউরা প্রবাল কুড়িয়ে এনে কেবিনে বসে খোস-গল্প করছে।

এমন সময় কান কাঁপিয়ে শন্ শন্ শব্দ শুরু হলো। সাগরের ঢেউ সাপের ফণা তুলে ফুঁসতে লাগলো। বিশাল জাহাজখানা মাতালের মতো টলছে। দুই বউ কাঁপছে থর থর করে। নাবিকরা প্রাণপণে জাহাজ সামলাবার চেষ্টা করছে।

শুরু হলো বৃষ্টি।

ঝড় আর বৃষ্টি। সমানতালে।

নাকোদা তাংগাং কাকভেজা হয়ে এসে বউদের কেবিনে ঢুকে সাবধান করে গেলো, তোমরা স্থির হয়ে কামবার ভেতরে থেকো। কেউ যেন বাইরে বেরিয়ে পড়ো না। খাবার-দাবার যা দরকার আমার লোকজন সবই তোমাদের কাছে পৌছে দেবে।

বউরা ভয়ে কেঁদে ওঠে, কি হবে তাহলে ? আমরা সবই কি এই সাগরে ডুবে মরবো ?

নাকোদা ওদের আশ্বাস দিয়ে বলে, না গো। তা মরতে হবে কেন ? সাগরে মাঝে মাঝে এমন ঝড় বৃষ্টি হয়। ও আমার গা-সহা হয়ে গেছে। তোমরা প্রথম এরকম দেখছো তো তাই তোমাদের ভয় করছে। দেখ না, খুব শিগগিরই এ ঝড় থেমে যাবে।

নাকোদার কথায় ওরা খানিকটা ভরসা পায়। ধড়ে প্রাণ ফিরে আসে।

নাকোদা এই ঝড়ের মধ্যে ওদের কাছে বসে অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলে। এর চেয়ে কত ভয়ংকর পরিস্থিতিতে সে বাণিজ্যপণ্যসহ জাহাজ বাঁচিয়ে নিয়ে কূলে এসে নোঙর করেছিল। সমুদ্রের জলে কত ভয়ানক জলজীব দেখেছিল। সে সব অদ্ভুত কথা, রোমহর্ষক গল্প বলে ওদের বোঝাতে চেষ্টা করত, এ ঝড় তো তার কাছে কিছুই নয়। একটা জোরে ফুঁ দিলে যেমন হয়, এ যেন ঠিক তেমনি।

দুটি বউ অবাক হয়ে নাকোদার কথা শোনে। কতক বা গল্প মনে হয়, কতক বা বিশ্বাস করে। তবে প্রাণে বল ফিরে পায়। এখনকার পরিস্থিতিটাকে হাল্কা মনে করার মত এটা যুক্তি খুঁজে পায় মনে মনে।

নাকোদা তাংগাং ওদের মনের অবস্থাটা আঁচ করতে পেরে খানিকটা স্বস্তি পায়। সুস্থ হয়। ফিরে যায় নাবিকদের কাছে। জাহাজের গতিপথ, বাতাসের অবস্থা, সমূদ্রের ঢেউ-সব কিছুর খবর সংগ্রহ করে যথাযথ নির্দেশ দেয়।

ঝড়ের বেগ ক্রমে কমে এসেছে। বৃষ্টিটাও ধরেছে। নাবিকরা খুশি। নাকোদা তাংগাং স্বস্তি পায়। ওর দুই বউ নিশ্চিন্ত হয়।

আকাশের কালো রং মুছে গিয়ে নীলের চাঁদোয়ায় ফোটে তারা, রূপোর থালার মত চাঁদ।

একটা খুশীর হাওয়া বইতে থাকে।

জাহাজ এতক্ষণে সাগর ছেড়ে একটা বড়ো নদীর মোহনার পথ ধরে ঢুকে পড়েছে নদীতে। তর্‌তর্‌ করে এগিয়ে যাচ্ছে নদীর অভ্যন্তরে। দুপারে তার ঘর বাড়ি, গ্রাম, শহর। নাকোদার ধন্দ লাগে। যেন তার চেনা। দেখা।

ক্রমে নদীর বাঁক ছেড়ে জাহাজ ঢুকে পড়ে সেই দহের প্রশস্ত মুখে। সেই দহ যার তিনপাশ ঘিরে আছে পাহাড়। আর জংগল। সেই নীল জল। আর সেই আদিম লোকেরা।

নাকোদা অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

নাবিকদের নির্দেশ দেয়, এখানেই থামাও। জাহাজ আর যেন দহের মধ্যে ঢুকতে না পারে।

নাবিকেরা নাকোদার নির্দেশ পালন করলো। তারা জাহাজটাকে আর ভিতরে নিয়ে গেলো না।

কিন্তু একী ! একটা ছোট ডিঙির মত নৌকা ? ওরা কারা আসছে জাহাজের দিকে ? কী চায় ওরা।

নাকোদা নাবিকদের হুকুম দিলেন। ডিঙিটাকে ধরে নিয়ে এসো।

সঙ্গে সঙ্গে নাবিকেরা একটা ছোট নৌকা বের করে ধাওয়া করলো ওদের। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা দুজন লোককে ধরে নিয়ে এলো। গায়ের রং তাদের কালো। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। বলিষ্ঠ চেহারা।

নাবিকেরা ওদেরকে হাজির করলো নাকোদা তাংগাঙের সামনে। লোক দুটো সোজা হয়ে দাঁড়ালো। মুখে কোন কথা নেই। চোখে বিস্ময় ঝরে পড়ছে।

আমাদের সেই সি তাংগাং না ? হ্যাঁ—হ্যাঁ। সেই-ই তো। দেরুম মাসির ছেলে সি তাংগাং ! কী চেহারা হয়েছে ! গায়ের রং কেমন উজ্জ্বল হয়েছে। কী সুন্দর জামাকাপড়। বাবা ! খুব ধনী হয়েছে।

অবাক হয়ে আপন মনে এসব নানান কথা বলতে থাকে লোক দুটো।

কী চাও তোমরা ?

নাকোদা তাংগাং ভয়ংকর স্বরে প্রশ্ন করলেন।

লোক দুটো থতমত খেয়ে চুপ করে রইলো।

নাকোদার চোখে আগুন।

লোক দুটো ভয়ে অস্থির। সি তাংগাং এমন ভয়ংকর রুক্ষমেজাজের হয়ে গেলো কেমন করে। সে তো আমাদের সোনার টুকরো ছেলে। ওকে কি ডাইনীতে পেয়েছে ? নাকি সত্যি সত্যি সে আমাদের চিনতে পারে নি ? আহা অমন ফূর্তিবাজ ছেলে কেমন যেন হয়ে গেলো ! দেরুম মাসি এ দৃশ্য দেখলে চোখে জল রাখতে পারবে না। একে তো কতদিন হয়ে গেলো সি তাংগাং তার কোলছাড়া। সে বৈ মায়ের আর তো কেউ নেই।

বুড়ো তালাঙের কথা ভাবো একবার। বয়েস হয়েছে। এখন আর আগের মত মাছ মারতে যেতে পারে না। শিকারে বেরুতে পারে না। রোজগার বলতে এখন কিছুই নেই। আর এখন কি তার খাটবার বয়েস ? কোথায় যোয়ান মদ্দ ছেলে রোজগার করে আনবে। ছেলের ফুটফুটে বউ বুড়োবুড়ীর সেবা করবে, তা নয়।

এসব কপাল ! ভাগ্যলিখন। নইলে দহের জলে ভাসতে ভাসতে সি তাংগাং এমন করে হারিয়ে যাবেই বা কেন ?

দেরুম মাসিকে খবরটা যে করেই হোক পৌছে দিতেই হবে। এখানে কোনো রকম ঝামেলা পাকিয়ে লাভ নেই। বেশি কিছু বলতে গেলে তাংগাং হয়ত তাদের আটকে রাখতে পারে। এখন প্রাণে বেঁচে পালানোই উচিত।

লোক দুটো মনে মনে এই সব হিসেব সেরে নিয়ে বললো, ভাই, আমরা কিছুই চাই নাই না। পাহাড়ের কোলে থাকি। পাহাড়ের জংগলে শিকার করি, দহের জলে মাছ মারি। আমরা গরীব। এত বড়ো জাহাজ তো কোন কালে দেখিনি। তাই দেখতে আসছিলাম কাছের থেকে।

—দেখা হয়েছে? নাকোদা জিজ্ঞেস করলো।

—হ্যাঁ। এখন দেখা হয়েছে।

ভয়ে ভয়ে জবাব দিলো লোক দুটো।

—বেশ তাহলে এখন যাও।

নাকোদা তাংগাং লোকদুটোকে ওদের নৌকা পর্যন্ত এগিয়ে দেবার আদেশ জারি করে নিজের কেবিনে চলে গেল।

নাবিকেরা ওদের নৌকায় তুলে ছেড়ে দিলো।

ওরাও দ্রুত নৌকা বেয়ে দহের জলের সীমানা ঘেঁষে ওদের চোখের আড়ালে চলে গেলো।

ক্রমে বেলা গড়িয়ে এলো। দিনের আলো নিভে গেলো। জাহাজের কেবিনে মোমের বাতি জ্বললো। ঘরগুলো আলোয় ভরে উঠলো। চারদিক ব্যেপে অন্ধকার ছড়িয়ে রইলো।

রাতের অন্ধকারে ঐ লোক দুটি এসে হাজির হলো দেরুম মাসির ঘরে। দরজায় টোকা মারলো। ভেতর থেকে সাড়া এলো, কে রে এতরাতে?

আমরা এসেছি মাসি। দরজা খোলো।

দেরুম মাসি ওদের গলার আওয়াজ চিনতে পেরে কোনোরকমে উঠে এসে দরজা খুলে দিলো। লোক দুটো হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। মাসিকে কাছে বসিয়ে বলতে লাগলো জাহাজের সেই সব ঘটনা। সি তাংগাং ঐ জাহাজের মালিক। মস্ত ধনী সে। তবে চেনা দেয়নি। ও নিশ্চয়ই মাকে চিনতে পারবে। তখন আর কিছুতেই আত্মগোপন করতে পারবে না।

দেরুম অবাক। কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। এরা কি বলছে সব। সি তাংগাং কতদিন পরে এসেছে। মায়ের কাছে ফিরে এসেছে দেখা

করতে। মায়ের জন্যে তার মন কেমন করছিল? তাকে দেখার জন্যে দেরুমের মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

পরের দিন ভোরবেলা ছোট ডিঙি নিয়ে তালাং আর দেরুম—দুই বুড়োবুড়ি দহের জলে পাড়ি দিলো। দূরে দেখতে পেল সেই মস্ত বড়ো জাহাজখানাকে।

দাঁড় টানতে লাগলো জোরে জোরে।

দহের জলে শব্দ উঠতে লাগলো ছপ্—ছপ্—ছপ।

দহের থির জল তির্ তির্ করে কাঁপতে কাঁপতে দূরে মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ ওদের চোখে পড়লো বিপরীত দিক থেকে আর একখানা নৌকা জনাকয়েক যাত্রী নিয়ে ওদেরই দিকে এগিয়ে আসচে।

ওরা হাঁক পাড়লো—আর এগিয়ো না। তোমরা কারা?

সি তালাং আর দেরুম ওদের কথার কোন উত্তর দিলো না। একই গতিতে নৌকা এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো।

বিপরীত দিক থেকে ওরাও ততক্ষণে কাছাকাছি এসে পড়েছে।

তোমরা কারা?

সি তালাং জবাব দিলো, আমরা পাহাড়ের লোক। জাহাজ দেখতে এসেছি। আমি পাহাড়ের মাতব্বর। তোমাদের জাহাজের মাতব্বরের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

সঙ্গে কোন অস্ত্র আছে?

তল্লাশি করতে পারো?

অপর নৌকার যাত্রীদের একজন সি তালাঙের নৌকায় এসে তল্লাশি করলো। সন্দেহজনক কোন কিছু না পেয়ে তারা ওদের জাহাজে নিয়ে এলো। জাহাজের ডেকের ওপর ওদের দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। নাকোদা তাংগাঙের কাছে খবর পাঠানো হলো।

কিছুক্ষণ পরে নাকোদা তাংগাং এসে উপস্থিত হলো। রাজার পোশাক। সকালের সূর্যের আলোয় ঝলমল করতে লাগলো।

ওকে দেখেই দেরুম হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো; তোকে কতদিন দেখিনি বাবা। তুই কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলি? মাকে কি তোর একবার মনে পড়েনি রে বাপ!

দেরুম কাঁদতে কাঁদতে হাঁপায়। আর কত কথা বলতে থাকে।

নাকোদা তাংগাং বিরক্ত বোধ করে।

একী উপদ্রব। কোথাকার এই বুড়ি! কে তার সন্তান?

বুড়ো সি তালাং চোখ মোছে। বুড়ীর মত বিলাপ সে করতে পাবে না। কিন্তু হারানো সন্তানকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে তারও বুকের ভেতরটা ছটফট করতে থাকে।

নাকোদা হাঁক পাড়ে, নাবিক। তোমরা এদের ফিরিয়ে দাও।

দেরুম হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

বুড়ীর কান্না শুনে বণিকের মেয়ে—নাকোদার প্রথম বউ বেরিয়ে আসে। সবকিছু শোনার পর নাকোদাকে বলে, বুড়ী কি বলতে চায়?

আমি নাকি ওর হারানো ছেলে।

আহা বেচারী।

তুমি ওর প্রতি সহানুভূতি দেখাচ্ছো?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ। মায়ের ব্যথা তুমি কি করে বুঝবে?

কিন্তু আমি যে ওর ছেলে নই!

প্রথম বউ আর কথা বাড়ালো না। মনটা তার ভারী খারাপ হলো বুড়ীর কথা ভেবে। সে ধীরে ধীরে তার নিজের কেবিনে ফিরে গেল।

রাজকন্যা ঘুমোচ্ছিল। কান্নাকাটির শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙে গেলো। সে তাড়াতাড়ি কেবিনের জানলা খুলে দেখলো, ডেকের ওপর একজন বুড়ো আর এক বুড়ি নাকোদা তাংগাঙের সামনে বসে। বুড়ি কাঁদছে হাউমাউ করে। চারপাশে নাবিকের দল ঘিরে। রাজকন্যা পোশাক বদল করলো। পরিচারিকাকে দিয়ে খবর পাঠালো সে আসছে। নাবিকেরা সরে গেলো ওখান থেকে। পরিচারিকার সঙ্গে রাজকন্যা এলো সেখানে।

নাকোদার কাছে সরে এসে জিজ্ঞাসা করলো, হ্যাঁ গো, বুড়িটা কে?

—পাহাড়ী।

—এখানে কী চায়?

—ওর ছেলে হারিয়েছে।

—তা এখানে কী?

—আমি নাকি ওর সেই হারানো ছেলে।

—বটে ?

—হ্যাঁ। সেই রকমই ওর কথা।

—আহা বেচারী। বোধ হয় তোমার মতই দেখতে ছিল ওর ছেলেকে। তাই তোমাকে দেখেই ওর ছেলের কথা কথা মনে পড়েছে। আহা বলই না যে তুমি ওর হারানো ছেলে। তাহলেই তো মিটে যায়। বুড়ীও শান্ত হয়। আর তোযারও তো কিছু ক্ষতি হবে না তাতে। মা বলতে তোমার আপত্তি কেন ?

—দেখ, তুমি যে কথা বোঝনা তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। নিজের কেবিনে ফিরে যাও। আমি যা করবার করছি।

রাজকন্যা আর কথা বাড়ায় নি। পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের কেবিনে ফিরে গেল।

নাকোদা তাংগাং স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। দূরে দাঁড়িয়ে তার নাবিকরা। ওরা স্থির দৃষ্টিতে দেখছে বুড়ী দেরুম আর সি তালাঙকে। ওদের চেহারার সঙ্গে নাকোদা তাংগাঙের চেহারার আশ্চর্য মিল। ঠিক তেমনি চোখ, নাক, ভুরুর গঠন। এমন কি বুড়ো সি তালাঙের চওড়া চোয়ালের সঙ্গে নাকোদার শক্ত চওড়া চোয়ালের বেশ মিল। নাবিকদের মনে প্রশ্ন জাগছে। ব্যাপারটা কি বল দেখি ভাই। এই বুড়ো বুড়ী কি সত্যিই আমাদের কাপ্তেনের মা-বাবা ? নইলে বুড়ী অমন চেঁচামেচিই বা করছে কেন ? কেউ কেউ ওসব উড়িয়ে দেয়। দূর ! কোথায় রাজার জামাই, আর কোথাকার জংলী বুড়ী। তোরা আবেগে গোটা ব্যাপারটাই তালগোল পাকিয়ে ফেলছিস। আসলে বুড়োবুড়ী কিছু ধান্দা করতে এসেছে।

নাবিকেরা ভাবছে। ওদের ভাবনার কথা ফিস-ফিস করে বলাবলিও হচ্ছে।

নাকোদার কান খাড়া।

বুড়ীর কান্না জাহাজকে ভরিয়ে রেখেছে। বাতাস কাঁপছে। দহের জল কাঁপছে তির্‌তির্‌ করে।

নাক্যেদার চওড়া চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো। নাঃ। এভাবে সে হেরে যাবে না। পিছনে ফেলে আসা জীবনের মায়া তাকে কাটিয়ে উঠতেই হবে। একদিকে ওপরে ওঠার সিঁড়ি, বাণিজ্য, জাহাজ, রাজকন্যা ভবিষ্যতে রাজা হওয়ার

সম্ভাবনা আর অপরদিকে আত্মপরিচয় দেওয়ার অর্থ ঐ বুড়োবুড়ীকে স্বীকার করে নেওয়া। নাবিকদের কাছে ছোট হয়ে যেতে হবে। রাজকন্যা হয়ত ওকে প্রত্যাখ্যান করবে। বণিককন্যা ওকে ঘৃণা করবে হয়ত। আসলে নিজের পরিচয় মেনে নেওয়ার মানে হবে ওর পতন। ওকে আবার এখনই ফিরে যেতে হবে পাহাড়ের জংলী জীবনে। নাঃ। তা হবে না। কক্ষনো হবে না।

নাকোদা তাংগাং রুষ্ট কণ্ঠে বললো, এই বুড়ী! তোমার কান্না থামাও! নইলে এই দহের জলে তোমায় ডুবিয়ে মারা হবে।

বুড়ো সি তালাং স্থির। কী বলছে তাংগাং। ও কি পাগল হলো?

এই বুড়ো! নিয়ে যাও তোমার বুড়ীকে।

নাকোদা বুড়ো তালাঙের ঘাড় ধরে নোয়ালো। বুড়ী হাউমাউ করে আর একবার কেঁদে উঠলো, ওরে তাংগাং, ওকে মারিস না বাবা। মারিস না। ও তোর বাবা। ও তোর জন্মদাতা বাপ। ওর গায়ে হাত তুলতে নেই। হাত খসে যায়।

চোপরাও বুড়ী কোথাকার!

তারপর নাবিকদের হুকুম দিলো, এদের দুজনকে ঘাড় ধরে নৌকায় নামিয়ে দাও। আর পাহারা রাখো, যেন আর কোন জংলী-নৌকা এদিকে না আসে।

নাবিকরা মাথা নীচু করে আদেশ পালন করলো। বুড়ো আর বুড়ীকে হাত ধরে জাহাজ থেকে নামিয়ে নৌকায় তুলে দিলো। একজন নাবিক বুড়ীর হাত ধরে নরম গলায় বললো, বুড়ীমা, আর এদিকে এসো না।

বুড়ী চোখের জল মুছতে মুছতে নৌকায় উঠলো। বুড়ো কোন রকমে দাঁড় ফেললো। ডিঙিখানা পাহাড়মুখো হলো। বুড়ী জাহাজের দিকে তাকালো। বুকের ভেতরটা তার হু হু করে উঠলো। হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আকাশের দিকের চেয়ে বলতে লাগলো, হে ভগবান। সি তাংগাং আমার ছেলে। আমি তাকে ঠিক চিনেছি। তুমি তাকে ফিরিয়ে দাও। ওকে আমি পাহাড়ের মধু খাইয়েছি। বনের ফল খাইয়েছি। আমার কোলের থেকে মাটিতে নামাইনি। হে ভগবান। হে পাহাড়ের দেবতা। তুমি সাক্ষী। তুমি এর বিচার কর। তুমি এর বিচার কর।

সন্তানহারা মায়ের কান্না বাতাসে ভেসে গেলো পাহাড়ের দেবতার কানে।

জংগলের গাছাগাছালি শুনলো বুড়ী দেরুমের বুকফাটা কান্না। পাহাড়ের কোলে ঘুরে-বেড়ানো জানোয়ারের দল একবার হাঁকার দিয়ে উঠলো।

আকাশে জমতে লাগলো কালো মেঘ।

বুড়োবুড়ী দহের জল পেরিয়ে ডাঙায় এসে উঠলো। পাহাড়ের দিকে মুখ করে বুড়ী কাঁদতে লাগলো, হে পাহাড়, হে জংগল, তোমার ছেলেকে তুমি ফিরে চাও। পাহাড়ী-দেবতার কাছে তোমরাও বিচার চাও। হে ভগবান এর বিচার তুমি কর।

বাতাসে বেগ সঞ্চার হলো। শন্ শন্ করে জংগল ভেদ করে বাতাস আছড়ে পড়তে লাগলো দহের জলে। দহের জল উত্তাল হয়ে উঠলো। দশ-ফুট, বিশ-ফুট, তিরিশ ফুট উঁচু ঢেউ উঠলো জলে। আকাশ ফুঁড়ে নামলো প্রবল বর্ষণ।

মহা প্রলয় শুরু হয়ে গেলো।

নাকোদা জাহাজের ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারলো পাহাড়ের দেবতা জেগেছে। বনের গাছপালা ক্রুদ্ধ হয়েছে। দহের জল ক্ষিপ্ত হয়ে ফণা তুলে ফুঁসছে। বাতাস সবকিছুকে ভেঙে নস্যাৎ করে দিতে চাইছে। প্রকৃতির এই রোষ তাকে ক্ষমা করবে না।

সে অন্যায় করেছে। অস্বীকার করছে তার জন্মভিটাকে। অস্বীকার করছে তার বাপ-মাকে। শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

নাকোদার মন অনুশোচনায় ভরে ওঠে। সে তার অন্যায় বুঝতে পারে। মায়ের জন্য তার মনটা অস্থির হয়ে ওঠে। তীব্র চীৎকার করে সে ডেকে ওঠে, মা—আ—আ—আ—

বাতাসে তার স্বর ডুবে যায়। জাহাজ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। জাহাজের সব মানুষজনের প্রাণ যায়। নাকোদা অকৃতজ্ঞতার শাস্তি পায়।

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

তারপর সব শেষ। ঝড়ও থেমে যায়। দহের জল স্থির হয়। নাকোদার ভাঙা জাহাজ চুণাপাথরের পাহাড়ে পরিণত হয়।

দহের নীল জলে তুধের মত সাদা পাহাড় সমাধির মত স্থির হয়ে ভাসতে লাগলো।

কুয়ালালামপুর থেকে সাত মাইল দূরে আজও সেই চুণাপাথরের পাহাড় দেখতে দেশ-দেশান্তর থেকে পর্যটক আসে।

রাজ্য জুড়ে লোকের মহাভাবনা।

রাজ অন্তঃপুরে দুশ্চিন্তা। রানীর চোখে ঘুম নেই। রাজপুত্রেরা বড়ই চিন্তিত। মহামন্ত্রী, মন্ত্রী, পাত্র মিত্র সকলেরই মহাভাবনা।

কী আশ্চর্য ব্যাধি। দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। উপশমের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। রাজার শরীর ক্ষীণ হয়ে আসছে। গায়ের রঙ সাদা ফ্যাকাসে

হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন শরীরের সব রক্ত কোনো ডাইনীতে শুষে নিয়েছে।

ডাক্তার-বদ্যি আসে, ওষুধ দেয়, আর চলে যায়।

ওরা কেউ রোগের কারণ ধরতে পারে না।

দেশ-বিদেশের ডাক্তার-বদ্যি-ওঝা সব হার মানলো।

এক ডাক্তার রাজদরবারে এসে জানালো, আমি একবার মহারাজকে দেখতে চাই। শেষ চেষ্টা করে দেখবো।

দরবারে উপস্থিত মন্ত্রীরা তার কথায় সন্দেহ করলেন। তারা সকলেই বললেন, তুমি কি পারবে?

ডাক্তার স্পষ্ট জবাব দিলো, সে কথা বলতে পারছি না। তবে আমার বিদ্যা যা আছে, তা দিয়ে আমাদের প্রিয় মহারাজার প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করবো।

মন্ত্রীরা সবাই সম্মতি দিলেন।

ডাক্তার মহারাজার শয্যার পাশে এসে বসলো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। তারপর ধীরে ধীরে বললো, মহারাজ, যদি অভয় দেন, তাহলে বলি।

রুগ্ন মহারাজা ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন। বললেন, বলো।

মহারাজ, কোনো ওষুধে আপনার রোগ সারবে না।

মহারাজার শয্যা-কক্ষে যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন সবাই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন ডাক্তারের মুখের দিকে। সকলের চোখে মুখে একটাই প্রশ্ন! তাহলে মহারাজের রোগ নিরাময় হবে কিভাবে। পৃথিবীতে এমন কোনো ডাক্তার-বদ্যি-ওঝা নেই যিনি মহারাজের রোগ সারিয়ে তুলতে পারেন? এমন কোনো ওষুধ নেই যাতে মহারাজ সুস্থ ও রোগ মুক্ত হতে পারেন?

ডাক্তার খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, একমাত্র অদর্ণ পাখীর স্পর্শই আপনাকে রোগমুক্ত করতে পারে।

মহামন্ত্রী মহারাজের মাথার কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন। সে পাখী কোথায় পাওয়া যাবে? কেমন দেখতে সে পাখীকে?

ডাক্তার নীরব।

মহামন্ত্রী আবার প্রশ্ন করলেন, বলুন, কোথায় সে পাখীকে পাওয়া যাবে? অকারণে বিলম্ব করবেন না।

ডাক্তার ধীরে ধীরে বললো, কোথায় সে পাখী থাকে তা আমি জানি না সে পাখী দেখতে কেমন তাও আমি জানি না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে

কোনো সৎ, বিনয়ী, নির্লোভ রাজপুত্র যদি সেই পাখীর খোঁজে বেরোয় তবে সে তার সন্ধান পাবে এবং পাখীকে ধরে আনতে পারবে। আমার স্থির বিশ্বাস রাজপুত্রদের মধ্যে যে-কেউ এ কাজ করতে পারবেন।

রাজপুত্ররা মহারাজার শয্যাকক্ষে দাঁড়িয়ে একথা শুনলো। আশ্চর্য বার্তা! অদর্ণ পাখী! কখনও তো তার নাম শোনা যায়নি!

তবে সে যাই হোক!

সেই অদর্ণ পাখীর খোঁজ করতেই হবে।

বড় রাজপুত্র পেড্রো নিজেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলো। মায়ের কাছে এসে বললো, মা, আমি যাবো অদর্ণ পাখীর খোঁজে। বাবাকে সারিয়ে তুলতেই হবে।

রাণী চোখের জলে দুগণ্ড ভিজিয়ে বললেন, খোকা, সেই দুর্গম অভিযানে তোর কত কষ্ট হবে।

বড় রাজপুত্র মাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

সেদিন রাজ পরিবারে সকলের চোখ ছলছল করছিল। আকাশ নির্মেঘ। শীতের বাতাস বইছিল ঝির ঝির করে। রাজকুমার সঙ্গে নিলো প্রচুর খাদ্য সামগ্রী আর তলোয়ার। আরোহণ করলো সবচেয়ে ভালো আর তেজী সাদা ঘোড়ার ওপর । ঈশ্বরের আশীর্বাদ চাইলো না।

বুকে সাহস, প্রাণে রাজপুত্রের অহংকার ভরসা করে বড় রাজকুমার সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সজোরে চাবুক কষালো ঘোড়ার পিঠে।

চিহিঁ—চি হিঁ—

কাতর শব্দ তুলে ঘোড়া ধুলোর ঝড় তুলে এগিয়ে চলতে লাগলো। রাজধানীর পথ পেরিয়ে গ্রামের মেঠো পথে সাদা ঘোড়া পাখাওয়ালা পাখীর মত উড়ে চলতে লাগলো। দুপাশের জনপদ যেন বাতাসে ভেসে ভেসে যেতে লাগলো উল্টো পথে।

হঠাৎ রাজকুমারের পথের সামনে এক বৃদ্ধ যেন রুখে দাঁড়াল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে লাগলো, বাবা, আমাকে দু-মুঠো খাবার ভিক্ষে দে না।

রাজকুমার ছুটন্ত ঘোড়ার রাশ টেনে হুঙ্কার ছেড়ে বললো, পথ থেকে সরে দাঁড়াও। এখন ভিক্ষে দেবার সময় নেই।

বাবা, ক'দিন হলো, কিছুই খাওয়া হয়নি। তোর তো অনেক খাবার আছে। আমাকে দু মুঠো দে না।

বটে। ভারী আস্পর্ধা তো! জানিস আমি এখন কোথায় চলেছি। আমা
এখন একদণ্ড থামার অবসর নেই। পথ থেকে সরে যা।

বৃদ্ধ কাঁপা কাঁপা গলায় তেমনিভাবে বলতে লাগলো, আমি জানি, তুই
বাবাকে বাঁচাবার জন্যে অদর্ণ পাখীর খোঁজে চলেছিস।

রাজকুমার বৃদ্ধের কোন কথাই কানে তুললো না। ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে
এগিয়ে গেল।

বৃদ্ধ পথ থেকে সরে এসে একটা পাথরের ঢিবির ওপর বসে দুঃখ করতে
লাগলো।

এদিকে রাজকুমারের ঘোড়া ছুটতে ছুটতে এক পাহাড়ের কিনারে
এসে হাজির হ'লো। পাহাড়ের পশ্চিম কোণে একগুহা ছিল। সেখানে
থাকতো এক সাধু। সে শুধু উপোস দিতো। প্রার্থনা জপতপ নিয়ে থাকতো
মাঝে মাঝে সমাধি যেতো। ভারী গম্ভীর আর সৌম্য প্রকৃতির চেহারা
একমুখ সাদা দাড়ি।

রাজকুমার সারাদিন ঘোড়া ছুটিয়ে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। পড়ন্ত বেলায়
শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়ছিল। কাঠের আগুন করে সাধু বসেছিল। রাজকুমার
তার কাছে গিয়ে বসলো। নানা কথার ছলে সে সাধুকে বললো, আমি অদর্ণ
পাখীর খোঁজে বেরিয়েছি। যে করেই হোক তাকে আমায় ধরতেই হবে। দেখি
সে পাখী কোথায় লুকিয়ে থাকে। আর তার ক্ষমতাই বা কি?

রাজকুমারের কথাবার্তা সাধুর ভালো ঠেকলো না। তার মনে হলো
রাজকুমার ভারী দাম্ভিক। সে রাজকুমারকে বললো, দেখ বাপু- তুমি মিছিমিছি
অদর্ণ পাখীর খোঁজে বেরিয়েছো। ও তুমি ধরতে পারবে না। একমাত্র
যাদের মনটা খাঁটি তারাই ও পাখী ধরতে পারবে, অন্য কেউ পারবে না। তুমি
ফিরে যাও।

রাজকুমার অসন্তুষ্ট হলো সাধুর কথায়। রুক্ষভাবে তাকালো তার দিকে।

সাধু বললো, রাজকুমার, বড়ো দুঃখের সঙ্গে একথা জানাচ্ছি যে, পাপী, আর
শয়তান যদি সে পাখীকে ধরবার চেষ্টা করে, তাহলে তার কঠোর শাস্তি হয়।
কেউ তাকে বাঁচাতে পাবে না।

রাজকুমার কঠোরভাবে বললো, ওহে বুড়ো সাধু, মনে রেখো রাজকুমার
পেদ্রো কাউকে ভয় করে না। তুমি শুধু বলে দাও, কোথায় সেই পাখীর বাসা।

বাকীটা আমি সামলে নিতে পারবো। তার জন্যে ঈশ্বরের কিংবা কোন সন্ন্যাসীর আশীর্বাদের দরকার হবে না।

সাধু বললো, বাছা, সে যাদুকর পাখী।

রাজকুমার বললো, যাদুকর পাখীই হোক, আর যা-ই হোক। আমি ওসব গ্রাহ্য করি না। তুমি ওর আস্তানার খবরটা দাও। তাহলেই হবে।

সাধু সতর্ক করে বললো, রাজকুমার। একটা কথা বারবার বলছি, শুধুমাত্র বিনয়ী আর ধার্মিকরাই ও পাখী ধরতে পারবে। অন্য কেউ পারবে না।

রাজকুমার বললো, তোমার এসব কথার মানে হয় না। তারচে' তুমি বল। কোথায় থাকে সেই পাখী। আমি অধৈর্য হয়ে পড়ছি।

সাধু আর বিশেষ কথা বাড়ালো না। চুপ করে গেল। খানিক পরে সে বললো, ঊষার আলো দেখা দিলেই সে অদর্ণ পাখীর আস্তানা বলে দেবে। এখন সে কথা বলার সময় নয়।

রাজকুমার পশমের একখানা কম্বল গায়ে জড়িয়ে সাধুর সেই আগুনের সামনে চোখ দুটি বন্ধ করে চুপ করে পড়ে রইলো।

ধীরে ধীরে রাত শেষ হয়ে এলো। পূর্ব দিগন্তে অন্ধকার অপসারিত হলো। আলো ফুটে উঠলো। রাজকুমার সাধুকে বললো, কই এবার বলো?

সাধু উঠে এলো পাহাড়ের গুহার ভেতর থেকে। বাইরের আলোয় তাকে ডেকে নিয়ে এসে সাধু বললো, ঐ দেখা যায় পূর্বদিকে পাহাড় শ্রেণী। ওখানকার একটি পাহাড়ের চূড়ায় একটি গাছ। গাছে ফুটে আছে নানান রঙের নানান আকারের ফুল। সেই গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালে থাকে ঐ অদর্ণ পাখী।

রাজকুমার, তোমাকে আমি আশীর্বাদ করি, তোমার দেবতার মত গতি হোক। পিতার আরোগ্যের জন্য তুমি ঐ কাঙ্ক্ষিত পাখী লাভ কর। তোমার অভিযান সার্থক হোক। তবে শেষবারের মত সতর্ক করে দিই, যদি তোমার মন পবিত্র হয়, তুমি সার্থক হবে, যদি তা না হয়, তবে তোমার ভাগ্যে আছে কঠিন শাস্তি।

ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন। তোমার সহায় হোন।

রাজকুমার সাধুকে প্রণাম করলো না। অদর্ণ-পাখীর সন্ধান দেবার জন্য ধন্যবাদও দিলো না। ক্ষিপ্রগতিতে ঘোড়ায় চড়ে সেই পাহাড়ের দিকে রওনা হয়ে পড়লো।

বাতাসের গতিতে ছুটে চললো তার সাদা ঘোড়া। মনে হল যেন বাতাসে চলেছে সাদা মেঘের একখানি টুকরো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজকুমার এসে পৌছলো পাহাড় শ্রেণীর কাছে। একখানি পাহাড় তাদের মধ্যমণি হয়ে আছে। তার মাথায় সাদা বরফের টুপি দেহখানি গাঢ় ধূসর রঙের আবরণে ঢাকা। মাথার ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একখানি মাত্র গাছ। তাতে নেই কোন পাতা। শুধু ফুটে আছে অসংখ্য ফুল। লাল, নীল, হলুদ, গোলাপী, সোনালী। কি বাহার সে ফুলের ছোট ছোট ফুল। সাদা বরফের টুপিটাকে আলো করে আছে যেন।

রাজকুমার অবাক-চোখে দেখতে লাগলো তার শোভা।

বিস্ময় আরো গভীর হলো তার।

রাজকুমার পাহাড়ের কোলে তার সাদা ঘোড়াটিকে রেখে উঠতে লাগলো পাহাড়ের গা-বেয়ে। বেশ কিছুটা পথ ওঠবার পর মাথা উঁচু করে দেখতে পেলো কিছু লোক যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই গাছের নীচে। দেবতাদের মত সুন্দর চেহারা। কিন্তু আশ্চর্য! ওরা এমন স্থির কেন? গভীর আগ্রহে রাজকুমার উঠতে লাগলো। আশ্চর্য ভাবে সে যেন পৌছে গেলো আকাশের উচ্চতায়। অপূর্ব সুগন্ধ ছড়িয়ে আছে চারিদিকে! নানা রঙের উজ্জ্বলতায় চারিদিকে যেন রামধনুর বিচিত্র খেলা। যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা সবাই মূর্তি এই নির্জন স্থানে এমন সুন্দর, পাথরের মূর্তি কে তৈরী করলো!

রাজকুমারের মনে প্রশ্ন জাগলো।

হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো, গাছের উপরের ডালে একটি পাখী রাজার মত বসে আছে। তার পালখের রঙ সোনালী। বিশাল নয় অথচ বিপুল জ্যোতি তার সর্বাঙ্গে।

রাজকুমার আরো দেখলো, ঐ সোনালী পাখীর পাখা থেকে খসে পড়েছে একটি সোনালী পালখ।

পাখী শিস্ দিয়ে পান পাইছে। এমন শিস রাজকুমার কোনদিন শোনে নি মনটা ভরে আসছে তার। শরীর জুড়ে নেমে আসছে ঘুম। পালখ নেমে আসছে রাজকুমারের খুব কাছে।

সোনালী পালখটি এসে ছুঁয়ে গেলো তার শরীর। সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারের শরীর পাথরের মত শক্ত হয়ে গেলো।

সোনালী পাখী গাছের ওপর থেকে শিস দিয়ে বললো,

রাজকুমার,
যোগ্য শাস্তি হয়েছে তোমার।
যারা পাপী আর অহংকারী
দেখ, দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি।
যদি কোন পুণ্যবান
এখানে এসে পৌছান,
হিং টিং থাং ভুং বান
মন্ত্রপূত জল তিনবার ছিটান,
তবেই হে রাজকুমার
ফিরে পাবে প্রাণ তোমার।

সোনালী পাখীর কথা শেষ হলো।
বাতাসে শোনা গেলো বিচিত্র ধ্বনি :
ফুঃ—থুং—টিং—তাং—ভোঃ—ও—ও—ও।
রাজকুমার পাথরের মূর্তিতে পরিণত হলো।

এদিকে বড় রাজকুমার ফিরছে না দেখে রাজধানীতে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়ে গছে। মহারাজও ক্রমশঃ শীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়ছেন। কারো চোখে ঘুম নেই।

মেজো রাজকুমার দিয়েগো অস্থির উঠেছে। মহারাজের কাছে মেজো াজকুমার প্রস্তাব রাখলে, বাবা আমি যাবো অদর্ণ পাখীর খোঁজে।

মহারাজার মন সায় দেয় না।
মহারাণীর মনও সায় দেয় না।
কিন্তু মেজো রাজকুমার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যেন!
সে যাবেই। সে ভীষণ তেজী আর জেদী।
মহারাজা মত দিলেন।
মহারাণী চোখের জলে বিদায় দিলেন।
রাজ্যের প্রজারা ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকলো মেজো রাজকুমারের যাত্রা থর দিকে!

বাতাস কাঁপিয়ে, ধুলো উড়িয়ে দিয়ে মেজো রাজকুমার ঘোড়া ছুটিয়ে বাতাসের গতিতে ছুটতে লাগলো।

রাজধানীর ফটক পার হয়ে মেঠো পথ ধরে ঘোড়া ছুটতে লাগলো। পথে সেই বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হলো, পাহাড়ের গুহার সেই সাধুর সঙ্গে দেখা হলো কিন্তু জেদী রাজকুমার এদের কারুর সঙ্গে সদয় ব্যবহার করলো না। ফলে তারও পরিণতি হলো ভয়ানক। অদর্ণ পাখীর সেই সোনার পালখের স্পর্শে সেও পাথরের মূর্তি হয়ে ঐ পাহাড়ের ওপরেই রইলো।

মেজো রাজকুমারও ফিরলো না।

রাজধানীতে কান্নার রোল পড়ে গেলো।

মহারাজার শরীর আরো ভেঙে পড়লো। দুই ছেলের শোক তার মনের ওপর কঠিন আঘাত করলো! মহারাজ মুষড়ে পড়লেন।

এদিকে ওপরের দুই দাদার ব্যর্থতায় ছোট রাজকুমারের জেদ আরো বেড়ে গেলো। সেও জেদ ধরে বসলো, অদর্ণপাখীর খোঁজ তাকে আনতেই হবে সেই সঙ্গে দুই দাদার খোঁজও সে বের করবে।

ছোট রাজকুমারের কথা শুনে রাণী কেঁদে আকুল।

খোকা, অবুঝের মত কথা বলিস না। তুই আমার শেষ সম্বল শিবরাত্তিরের সলতে। তোকে আমি কিছুতেই এ কাজে বেরোতে দেবে না। নিশ্চয়ই কোন মায়াবী তোকে আমার কোল ছাড়া করতে চাইছে। খোকা যাবার জন্যে অমন উতলা হোস না।

কিন্তু ছোট রাজকুমারের সেই এক গোঁ। সে যাবেই।

রোগশয্যায় মহারাজ। ছোট রাজকুমার তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলে এক শোকাবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। মহারাজ মেয়ে মানুষের মত শব্দ করে কেঁদে উঠলেন। মন্ত্রীগণ সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

কিন্তু ছোট রাজকুমার শক্ত। পাথরের মত। সে মহারাজের পায়ের কাছে বসে শান্তকণ্ঠে বললো, বাবা, তোমার এই মলিন-মুখ অমি সহ্য করতে পারছিনা। আমার ওপরের দুই দাদা নিখোঁজ। অদর্ণ পাখী মায়াবিনীর মতো আমাদের সবকিছু ছিনিয়ে নেবে, তা হতে পারে না। আমরা কারুর কাছে অপরাধ করিনি। কোন অসৎ কাজ করিনি। ঈশ্বর আমাদের সহায় হবেন। তোমার আশীর্বাদ আমার পাথেয় হবে।

মহারাজ ছোটরাজকুমারকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তবু তার যুক্তিকে মহারাজ অবজ্ঞা করতে পারলেন না। চোখের জলে ছোট রাজকুমারকে বিদায় দিলেন তিনি।

আশীর্বাদ করে বললেন, করুণাময় ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। আমার এবং এই রাজ্যের সকল মানুষের আশীর্বাদ রইলো তোমার ওপর। অদর্ণপাখীর কোনো যাদুই তোমার ওপর প্রভাব খাটাতে পারবেনা। তুমি তোমার দাদাদের এবং অদর্ণ পাখীকে নিয়ে আসবে।

ছোট রাজকুমার নতজানু হয়ে বাবার কাছ থেকে আশীর্বাদ নিলো। সে বললো, আমি অন্তরে অন্তরে বুঝতে পারছি, জয় আমার হবেই। আমি কোন অস্ত্র নিয়ে যাবো না। বিনম্র প্রার্থনাই হবে আমার অস্ত্র।

মহারাজের দুই গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরলো।

তিনি বললেন, বিদায়! বিদায় রাজকুমার। বিদায় প্রিয় পুত্র। বিদায়।

রাজকুমার প্রাসাদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। বেরিয়ে এলেন পথের ধূলোয়। সঙ্গে রইলো না কোনো ঘোড়া, হাতী, সেনা। শুধু নিলো কিছু খাদ্য সামগ্রী আর একটি বাঁকানো লাঠি।

অজানা পথ। পদে পদে বিপদ। তবু রাজকুমার অদম্য সাহসে ভর করে পাড়ি দিলেন। মাথার ওপর দিনের বেলার প্রখর রোদ। বেলা পড়তেই নেমে আসে প্রাণ জুড়ানো বাতাসের ঢেউ। রাজকুমার রাতে কোন গাছের নীচে বিশ্রাম করে। আবার উষার আলো ফুটতে না ফুটতেই বেরিয়ে পড়ে তার অভিযানে।

হাঁটছে তো হাঁটছেই! পথ যেন ফুরোতেই চায়না। দিনের পর দিন চলে যায়। সপ্তাহও ফুরিয়ে যায়। রাজকুমারের চলার গতি বাড়ে। কত গ্রাম পার হয়ে আসে।

অবশেষে অদ্ভুতদর্শন এক ভিখারীর সঙ্গে দেখা। শীর্ণ চেহারা। পা দুটো তার কাঁপছে থর থর করে। কাঁপা গলায় সে ভিক্ষা চাইলো কুমারের কাছে, বাবা, তিনদিন খাইনি। আমায় খেতে দে।

বৃদ্ধকে দেখে কুমারের ভারী দয়া হলো। বৃদ্ধকে হাত ধরে বসিয়ে তাকে কিছু খাবার খেতে দিলো। বৃদ্ধ ওর কাছ থেকে খাবার পেয়ে ভারী খুশী।

সে ধন্যবাদ জানিয়ে বললো, ভগবান তোমায় আশীর্বাদ করুন বাবা, জীবনে এমন খাবার আমি কোনোদিন দেখিনি।

স্বর্গের দেবতারা ওপর থেকে দেখলেন এ দৃশ্য। এক রাজকুমার তার সমস্ত আভিজাত্য আর অহংকার বিসর্জন দিয়ে একজন পথের ভিখিরিকে নিজের হাতে খাইয়ে দিচ্ছে।

মর্ত্যের মুনিঋষিরা দিব্য দৃষ্টিতে এই দৃশ্য দেখলেন।

ছোট রাজকুমার লজ্জিতভাবে বললেন, আর্তকে সেবা করা মানবধর্ম। আমি তো সেই কর্তব্যটুকুই করেছি।

বৃদ্ধ তার জবাবে অত্যন্ত খুশী হলো। তার ঝুলি থেকে একটি ছোট ছোরা বের করে তার হাতে দিয়ে বললো, রাজকুমার, এই ছোট্ট ছোরাখানি আমার স্মৃতি হিসেবে কাছে রেখো। অদর্ণ পাখীর খোঁজে বেরিয়েছো তুমি। হয়ত এটা কোন কাজে লাগবে।

রাজপুত্র বৃদ্ধের কথায় অবাক হয়ে গেলো।

সে কী! আপনি আমার অভিযানের কথা জানলেন কেমন করে?

বৃদ্ধ সেকথার কোন স্পষ্ট জবাব না দিয়ে বললো, যা বলছি শোনো এবং মনে রেখো। যখন তুমি অদর্ণ পাখীর খোঁজে পাহাড়ের ওপরে সেই স্বর্গীয় গাছের নীচে পৌছবে, তখন তোমার ঘুম-ঘুম পাবে, শরীরটা অবসন্ন হয়ে আসবে। সেই সময়টা বড়ো কঠিন। ভীষণ সতর্ক থাকতে হবে তোমাকে। সে সময় তোমাকে জেগে থাকতেই হবে। যদি তা না পারো, তাহলে তুমি ঐ পাখীর যাদুতে কঠিন পাথরের মূর্তি হয়ে যাবে। তাই বলছি, রাজকুমার খুব সাবধান। যখনই তোমার ঘুম-ঘুম পাবে, তখনই এই ছোট্ট ছোরার ফলাটুকু তোমার শরীরে ঢুকিয়ে দেবে, ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসবে। যন্ত্রণায় শরীরটা ছটফট্ করতে থাকবে, আর ঘুমের ভাব তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে অনেক দূরে।

বিস্মিত রাজকুমার বৃদ্ধকে ধন্যবাদ জানালো, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

বৃদ্ধ বললো, ধন্যবাদের কোনো প্রয়োজন নেই রাজকুমার। যেকোন সদয় মানুষ তোমার মত হৃদয়বান যুবকের উপকার করবে।

বৃদ্ধ তার ঝুলি থেকে একটি ছোট্ট বোতল বের করলো। তাতে ছিল কমলা

রঙের তরল খানিকটা। বৃদ্ধ বোতলটাকে সজোরে ঝাঁকালো। দেখতে দেখতে ঐ তরল পদার্থ রামধনুর মত সাতরঙা হয়ে উঠলো।

রাজকুমার অবাক হয়ে দেখতে লাগলো সেই দৃশ্য।

বৃদ্ধ বললো, এই জলের অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। এটি তিনবার যদি তোমার দাদাদের পাথরের মূর্তির ওপর ছিটিয়ে দাও, তাহলে তারা আবার প্রাণ ফিরে পাবে।

ছোট রাজকুমার অবাক। তার চোখে মুখে প্রশ্ন। তার দাদারা পাথরের মূর্তি হয়ে গেল কেন? কিন্তু সে প্রশ্ন করার সাহস ওর নেই।

বৃদ্ধ ওর মানের কথা বুঝতে পেরে উত্তর দিলো, তোমার দাদারা সকলে গর্বিত আর নির্দয় ছিল। তাদের মনটাও খাঁটি ছিল না। তাই ওরা পাথর হয়ে গেছে।

তুমি যদি অদর্ণপাখীকে ধরতে পারো, তাহলে এই জল তুমি তিনবার তোমার দাদাদের গারের ওপর ছড়িয়ে দিয়ো, ঈশ্বরের কৃপায় ওরা আবার প্রাণ ফিরে পাবে।

এই বলে বৃদ্ধ তার হাতে বোতলটি তুলে দিলো। আর তাকে বলে দিলো কোন্ পথে সে অদর্ণপাখীর খোঁজে যাবে।

রাজকুমার তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেই ছোট্ট ছোড়া আর বোতলটি সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

অনেক পথ হেঁটে রাজকুমার সেই পাহাড়ে এসে পৌছলো। সে দেখলো সেই সুন্দর গাছ। তার মাথায় নানা রঙের ফুলের সমারোহ। আর দেখতে পেলো অনেকগুলি পাথরের মূর্তি। অবাক হয়ে দেখতে লাগলো সে। প্রতিটি মূর্তি যেমন নিখুঁত আর তেমনি সুন্দর। ওরই মধ্যে রাজকুমার দেখতে পেলো তার বড়দা পেড্রো আর মেজদা দিয়েগোকে। মনটা তার ভারী খারাপ হয়ে গেলো।

গাছের উপরে দেখতে পেলো একটা অপূর্ব পাখী। মনে মনে ভাবলো, এইটাই সেই অদর্ণপাখী। স্বর্গীয় পাখী।

কিন্তু ভারী আশ্চর্য হলো সে। বাতাসে ভেসে আসছে মিষ্টি গান। পাখীর

এমন মিষ্টি গান সে তো কখনও শোনে নি। ও কি! গাছের ওপর থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসছে একটি সোনালী পালক! একী! তার শরীর এমন অবসন্ন হয়ে পড়ছে কেন? তার ঘুম পাছে কেন? নিশ্চয়ই তার ওপর ঐ পাখীর যাদুশক্তি ভর করছে!

রাজকুমার সেই ছোট্ট ছোরাটি নিয়ে তার বাঁ হাতে বিদ্ধ করলো। অমনি ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো তার শরীর থেকে। অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠলো সে।

ঘুম তাকে জড়িয়ে ধরতে পারলো না।

হাতের যন্ত্রণা ধীরে ধীরে কমে এলো।

রাজকুমার শিস দিয়ে ডাকলো সেই পাখীকে।

সোনালী ডানা মেলে বাতাসে ভর করে পাখীটি নেমে এসে বসলো রাজকুমারের কাঁধের ওপর। সে থপ্‌ করে ধরে ফেললো তাকে।

সোনার শিকল পরিয়ে দিলো পাখীর পায়ে। নিজের কোমরবন্ধের সঙ্গে তাকে বেঁধে কাঁধের ওপর বসালো। তারপর বৃদ্ধের দেওয়া বোতল থেকে জল নিয়ে ছড়িয়ে দিলো বড়দা পেড্রোর মূর্তির গায়ে। মুখ থেকে তার বেরিয়ে এলো অদ্ভুত কতগুলো শব্দ—

হিং—টিং—থাং—ভুং—বান।

রাজকুমার আবার জল ছিটালো।

আবার ঐ শব্দগুলো উচ্চারিত হলো।

রাজকুমার তৃতীয় বার জল ছড়িয়ে দিলো।

আবার শব্দ উঠলো—হিং—টিং—থাং—ভুং বান।

দেখতে দেখতে পেড্রোর মূর্তি নড়ে উঠলো।

রাজকুমার এবার মেজদা দিয়েগোর গায়েও এমনি করে তিনবার জল ছিটিয়ে দিলো। তিন তিনবার মন্ত্র উচ্চারিত হলো হলো।

পেড্রো আর দিয়েগো প্রাণ ফিরে পেলো। ওরা দুজনেই খুব খুশী। ছোট ভাইকে ওরা ধন্যবাদ জানালো। কিন্তু ছোট রাজকুমারের কাঁধের ওপর অদর্শ পাখীটিকে দেখে ওরা বিমর্ষ হলো। ভাবতে লাগলো,' তাহলে ছোট ভায়ের কাছে আমরা হেরে গেলাম!

ছোট ভাই জুয়ান ওদের মনের খবর আঁচ করতে পারলো না। আনন্দে

টগবগ করছে তার মন। কতদিন পরে সে দাদাদের কাছে পেয়েছে। সে বলতে লাগলো সেই বৃদ্ধের কথা, কী ভালো মানুষ তিনি। তিনিই আমাকে পথ বলে দিলেন। একটি ছোরা দিলেন। আর এই বোতলের মধ্যে ভরা অদ্ভুত জল দিলেন। এতেই তো তোমরা প্রাণ ফিরে পেলে!

কিন্তু পেড্রো আর দিয়েগো তখন সে কথাগুলো তেমন মনোযোগ দিয়ে শুনছিলো না। তারা তখন অন্য কথা ভাবছিলো। বড় ভাই পেড্রো জুয়ানকে একটু অন্যমনস্ক দেখে যেই তার তরবারি খুলে আক্রমণ করতে যাবে অমনি অদর্ণপাখী ভীষণ চীৎকার করে উঠলো। জুয়ান পেড্রোর তরবারিটি ধরে ফেললো।

পেড্রো বললো, জুয়ান, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। আজকের এই ঘটনা তুমি রাজপ্রাসাদে ফিরে কাউকে বলতে পারবে না। তাহলে তোমাকে প্রাণে শেষ করা হবে। মনে রেখো, তোমার মত প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমরা বাঁচাতে চাইনা।

জুয়ান অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো পেড্রোর মুখের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বললো, বেশ, কোনদিন একথা কাউকে বলবো না। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। তবে এটাও বলে রাখি তোমাদের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই। তোমাদের ব্যবহারে আমি এতটুকু দুঃখও পাইনি। কারণ আমি তোমাদের স্বভাবটা জানি। এখন বাবার কাছে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। তাঁকে খুব অসুস্থ দেখে এসেছি।

কয়েকদিনের মধ্যেই ওরা রাজ্যে ফিরে এলো। রাজা ফিরে পেলেন তার তিন ছেলেকে। আর পেলেন অদর্ণপাখীর দর্শন।

পাখীর মিষ্টি গান রাজার কানে যেতেই রাজার ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে মুখখানায় গোলাপী আভা ফুটে উঠলো। শরীরে ফিরে এলো শক্তি। রাজা শয্যার ওপর উঠে বসলেন। হাঁক দিলেন, মহামন্ত্রী!

মন্ত্রীসভার সবাই রাজার সেই পুরনো স্বর শুনে খুশী হয়ে ছুটে এলেন। মহারাণী এলেন। সকলেই অবাক। রাজাকে দেখে অবাক। পাখীকে দেখে অবাক। পাখীর মিষ্টির স্বর শুনে অবাক।

রাজা বললেন, ঘোষণা করে দিন, আমার রাজ্যে একটা সপ্তাহ আনন্দ-উৎসব চলবে। রাজপ্রাসাদ থেকে ফল, মিষ্টি বিতরণ করা হবে। আর চলবে নাচ, গান।

অদর্ণ পাখী রাজার কথায় সায় দিয়ে মিষ্টি শিস দিলো।

পাখীর শিস বাতাসে ভেসে ভেসে পৌছলো রাজ্যের সকল নরনারীর কানে। শিশুদের প্রাণে। আনন্দের ঢেউ জাগালো তাদের মনে। রাজ্যের পাখীরাও গান গেয়ে উঠলো। ঘরে ঘরে পতাকা উড়তে লাগলো পত্ পত্ করে। কমলা রঙের সেই পতাকায় সোনালী পাখীর ছাপ।

রাজ্যে উৎসব, আনন্দ, হৈ হৈ শুরু হয়ে গেল।
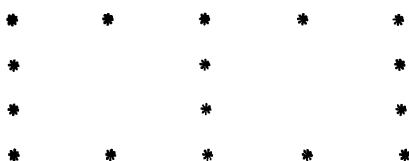
শুধু এক সপ্তাহ নয়। এই আনন্দ-উৎসব চলেছিলো বহুদিন।

রাজা দীর্ঘ দশ বছর জীবিত থেকে রাজ্য সুশাসন করলেন। তারপর একদিন অদর্ণপাখীর পরামর্শে দিনক্ষণ দেখে ছোট ছেলে জুয়ানকে রাজ্যে অভিষেক করলেন।

পেড্রো আর দিয়েগো শাস্তি পেলো তাদের কু-স্বভাবের জন্য।

রাজ্যের সবাই সুখী হলো। শান্তি পেলো।

সে অনেকদিন আগেকার কথা।

এক ছিলো চাষা। তার ছিলো তিন ছেলে।

ভারী গরীব। দিন আনে দিন খায়। নিত্য তাদের অভাব। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তাতে যেদিন আয় থাকে না ; সেদিন আহারও জোটে না। পাত্রের জল গড়িয়ে তেষ্টা মেটায়।

তিন্ তিনটে যোয়ান ছেলে।

কিন্তু করবেই বা কী।

শরীর আছে খাটবার জন্যে। কিন্তু কাজ কোথায়?

যদি বা কাজ মেলে, মেলে না মজুরী।

বড় ছেলে রাগ করে বললে, ভিন্ গাঁয়ে যাবো!

সেখানে কাজ পাবি?

হ্যাঁ। জমিদার বাড়ি যাবো, কাজের কথা বলবো। ওদের তো কত কাজের লোক দরকার হয়। যা হোক একটা—

চাষা খুশি! যা হোক। তবু একটা হিল্লে হবে ছেলেটার। ঘরে চুপচাপ বসে থাকলে মনটাও ভালো থাকে না।

দিন পনেরো পরে বড় ছেলে ফিরে এলো। মনটা ভার-ভার। চাষা জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ রে, ফিরে এলি যে! কাজ হলো না!

বড় ছেলে সংক্ষেপে বললো, নাঃ!

চাষা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

বড় ছেলে বললো, জমিদার যা বলবে, তাই করতে হবে। না পারলে মজুরী হবে না। কাজও থাকবে না।

তুই কাজ করিস নি? চাষা জিজ্ঞেস করলো বড় ছেলেকে।

পারিনি।

চাষা চুপ করে গেলো।

মেজ ছেলে পাশেই বসেছিলো। সব শুনে ভাবলো, দাদা কোন কাজের নয়। কাজ পেয়েও মনিবকে তুষ্ট করতে পারলো!

সে বললো, বাবা, আমি যাবো কাজের খোঁজে। ঐ জমিদারের বাড়িতে আমি কাজ করবো।

চাষা মেজছেলেকে যাবার সম্মতি দিলো।

দিন পনেরো পর মেজছেলেও ফিরে এলো। মনটা ভার-ভার। চাষা মেজছেলেকে জিজ্ঞেস করলো, কিরে, ফিরে এলি যে। কাজ হলো না!

মেজছেলে কোনো জবাব দিলো না। দাওয়ায় চুপটি করে বসলো।

দীর্ঘশ্বাস পড়লো তার।

ছোট ছেলে উঠোনে বসে কাঠ কাটছিলো। মেজদার দিকে তাকালো।

রপর দা-খানা নামিয়ে উঠে এলো। দাওয়ার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, া হলো? তুমিও ফিরে এলে? জমিদার-বাড়ি কাজ পেলে না।

—কাজ ছিলো করতে পারলাম না।

—কি পারো? ছোট ছেলের অভিমান ঝরে পড়লো।

ছোট ছেলে গর্জন করে উঠলো, আমরা এতগুলো লোক তাহলে খাবো কি? শ এবার আমি যাবো। দেখি কিছু রোজগার করা যায় কি না। ভগবান রীরও বুদ্ধি দিয়েছেন সেগুলো খাটিয়েই খেতে হবে। দেখি, কী করা যায়।

বাবার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ছোট ছেলে বেরিয়ে পড়লো।

ওদের গ্রাম থেকে মাত্র একদিনের পথ। মাঝে একখানি নদী। ঝির ঝির রে শীতের সময় বয়ে চলে। জল কমে যায়। ছোট ছেলে খেয়া-নৌকার রসা না করে ঝাঁপ দিলো জলে। সাঁতরে ওপারে গিয়ে পৌঁছলো। শীতের ত্তরে বাতাস কনকনিয়ে বিঁধতে লাগলো গায়ে। রোদে ভিজেজামা কিয়ে গেল।

সূর্যদেব ডুবলো।

ছোট ছেলেটি এসে পৌঁছলো জমিদার বাড়ি। ক্ষিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। াউকে কোন কথা না জিজ্ঞেস করে সোজা গিয়ে হাজির হলো খাজাঞ্চিখানায়। সখানে এক বুড়ো খাতার ওপর ঝুঁকে কি একটা লিখছিল।

সে হাঁকলো, জমিদারবাবু আছেন?

বুড়ো মাথা তুললো না।

ছেলেটি আবার ডাকলো, জমিদারবাবু আছেন নাকি?

বুড়ো ঘাড় না তুলেই প্রশ্ন করলো, কে রে?

আমি ভিন গাঁয়ের চাষার ছেলে। কাজের খোঁজে এসেছি। আমার াম বললে চিনতে পারবে না।

জমিদারের সঙ্গে দেখা হবে না।

তাহলে এখানেই বসলাম। দেখা না করে আমি ফিরছি না।

কী ঝামেলায় পড়া গেল?

তোমার আবার ঝামেলা কিসের? যত ঝামেলা তো আমার? ক্ষিদেয়

আমারই তো পেট চোঁ-চোঁ করছে। আমাকে তো অপেক্ষা করতেই হ

কার জন্যে হে যুবক!

ভেতরের থেকে একটা রাশভারী লোকের গলা শোনা গেল।

আজ্ঞে······জমিদারবাবুর জন্য।

কি দরকার!

কাজের খোঁজে এসেছিলাম।

জমিদার খাজাঞ্চিখানায় এসে ঢালা বিছানায় বসলেন। ভারী গলায় জান চাইলেন কী ধরনের কাজ চায়। তারপর তিনি জানালেন তাঁর কাজের দু শর্ত পালন করতে হবে। এক হলো, তিনি যে আদেশ দেবেন, যত অসুবিধা থাকুক, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। নইলে তার সেদিনে আহার বন্ধ। মজুরীও হবে না।

ছেলেটি রাজী হয়ে গিয়ে জানতে চাইলো, সারাদিন খাটতে হবে?

জমিদারবাবু বললেন, না। কাজ খুব কম। তবে যতটুকু দেওয়া হবে ত পরিশ্রমের।

ছেলেটি জানতে চাইলো, যেদিন কাজ থাকবে না, সেদিন খাবো কি?

জমিদারবাবু চট্ জলদি জবাব দিলেন, মজুরীর জমানো পয়সা থেকে।

মজুরী খুব বেশি বুঝি? ছেলেটি জানতে চাইলো।

জমিদারবাবু ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

ছেলেটি রাজী হয়ে গেল। জমিদার বাড়িতে তার থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত পাকা হয়ে গেল। বছর শেষে খাওয়া-থাকার দাম বাদ দিয়ে যা থাকবে তাই নিয়ে সে বাড়ি ফিরবে।

প্রথম দিন থেকেই ছেলেটি মনোযোগ দিয়ে কাজ আরম্ভ করলো। বাড়ির ফাই ফরমাস খাটা, জমিতে লাঙল দেওয়া, গরু বাছুর দেখা, জমিদারের গা-গতর টিপে দেওয়া—সব কাজই সে যত্ন নিয়ে করতো। জমিদার তার কাজে মোটামুটি খুশি।

কিন্তু খাজাঞ্চিবাবুর কথাবার্তা তো কানে ভালো ঠেকে না। ছেলেটির নামে প্রতিদিনের মজুরী বাবদ অনেক টাকা জমেছে। ছোঁড়াটা বছর শেষে অনেক-গুলো টাকা নিয়ে যাবে। মাগো! তাই হয় নাকি? এই মিয়ার হাত থেকে জল গলে না, আর টাকা চলে যাবে জলের মতো? বটে!

একদিন জমিদার সন্ধ্যেয় ছেলেটাকে ডেকে বললেন, কাল ভোরে গরুগুলো চমের মাঠে নিয়ে যাস। সেখানে বাঁশ বাগানে কচি কচি পাতা গজিয়েছে। গুলোকে খাওয়াস। তুই আবার যেন পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়াস না! ই খাবে। তুই শুধু বসে থাকবি।

জমিদার মনে মনে ভাবলো, কেমন মজা! গরুগুলো পাতা খেতে পারবে আর তোর মজুরীও হবে না।

কিন্তু ছেলেটি কোন কিছু চিন্তা না করেই উত্তর দিলো, বেশ পারবো। গরুগুলো খাবে আর আমি বসে থাকবো, এই বই তো নয়।

জমিদার মনে মনে হাসলেন।

এদিকে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে গোটা কয়েক গরু নিয়ে সে রিয়ে পড়লো। পশ্চিমে পাহাড়ের কোলে বাঁশবাগান। সবুজ কচি পাতা চক্ করছে ভোরের আলোয়।

একটা খোঁটায় গরুগুলিকে বেঁধে বললো, ওঠ, লাফিয়ে লাফিয়ে বাঁশের তা চিবো। আমি এই বসলাম।

এই বলে সে খানিকটা দূরে এসে বসলো। সামান্য যা ঘাস ছিল মাটিতে, গুলি শেষ করে মাটিতে আরাম করে বসে জাবর কাটতে লাগলো। লাফিয়ে া পাতা খাবার নামগন্ধটি পর্যন্ত নেই।

ছেলেটি বেশ খ্যণিকক্ষণ দেখলো। তারপর অধৈর্য হয়ে একটি গরুকে ঠ দিয়ে পেটাতে শুরু করলো। আর বলতে লাগলো, ওঠ, লাফা। গাছের র সবুজ পাতা লক্লক্ করছে। খাবার নামটি নেই। ওঠ, ওঠ হতভাগা!

গরুগুলো মার খেয়ে তারস্বরে ডাকতে থাকে, হাম্বা—আ—আ—আ।

ছেলেটি ততই পেটাতে থাকে।

গরুগুলোর এরকম ডাক শুনে গাঁ থেকে লোক ছুটে এসেছে। সকলের । এক প্রশ্ন, ওই ছোকড়া, গরুগুলোকে অমন করে ঠ্যাঙাচ্ছো কেন?

ছেলেটি ওদের কথা কানেই তোলে না।

সে তেমনিভাবে মারতে থাকে আর বলতে থাকে, ওঠ, গাছে ওঠ।

ছেলেটার অমন কাণ্ড দেখে সবাই তাজ্জব।

ক্রমে খবরটা জমিদারের কানে গিয়ে পৌছলো। হাঁ-হাঁ করে তিনি ছুটে ান। ওরে থাম হতভাগা। গরুগুলো মরে যাবে। আর ঠ্যাঙাস না।

ছেলেটি একই ভাবে ঠ্যাঙাতে থাকে আর বলতে থাকে, গাছে ওঠ। নইলে বাঁশপাতা খাবি কি করে।

আর গরুগুলি প্রাণপণে চীৎকার করতে থাকে।

শেষটায় জমিদারবাবু হুকুম দিলেন, ওরে হতভাগা থাম। আমি আমার আদেশ ফিরিয়ে নিচ্ছি। গরুতে গাছে ওঠে না।

ছেলেটি থামলো।

জমিদার স্বস্তি পেলেন। গরুগুলো বাঁচলো।

খাজাঞ্চিবাবু ছেলেটির নামে সেদিনের মোটা টাকার মজুরী লিখে রাখলেন।

সেদিন রাত্রে জমিদারবাবুর ঘুম হলো না। গালে থাপ্পড় দিয়ে ছোঁড়াটা অনেকগুলো টাকা মেরে নিলে। যা হোক। ওকে আরো কঠিন কাজ দিতে হবে। মনে মনে ঠাওর করতে লাগলেন কিভাবে ওকে জব্দ করা যায়।

শয়তানের ছলের অভাব হয় না। সময়মত মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। দিন তিনেক পরে ছেলেটিকে উঠোনে ডেকে বললেন, দেখ বাবা, শুনেছি কোন্ একদেশে শূন্যে বাগান আছে। তা সে সব দেখার সৌভাগ্য তো আর হবে না! ভাবছিলাম, আমার ঐ টালির চালের মাথায় সামান্য খানিকটা জায়গায় তুই যদি একটা বাগান করতে পারিস—

সে আর এমন কী কথা! নিশ্চয়ই পারবো।

উৎসাহের সঙ্গে জবাব দিলো ছেলেটি।

জমিদার ওর কথায় খুশি। বেশ তো, কাল থেকে তুই কাজে লেগে পড়। দিন দশেকের মধ্যেই আমার বাগানে ফুল ফুটবে। কি বল?

জমিদার দাঁত বের করে হাসলেন।

ছেলেটি ও দাঁত বের করে হাসলো।

কারুর হাসিতে শব্দ উঠলো না।

পরের দিন সকালে টালিভাঙার শব্দে জমিদারবাবুর ঘুম ভাঙ্লো। গৃহিনী এসে জমিদারকে ডেকে বললো, দেখ, তোমার চাকরের কাণ্ড। ঘরের মাঝখান থেকে সূর্যের আলো এসে পড়েছে।

তার মানে?

ওপরের টালি সব ভেঙে গেছে।

কি করে?

ঐ তোমার চাকরটা ?

সে বুঝি ভাঙ্ছে ?

হ্যাঁ।

মোটা শরীরটাকে কোন রকমে টানতে টানতে হাজির হলো ঘরের মাঝখানে। এই ঘরটাতে জমিদার গৃহিণী ঘুমোন।

জমিদার ঘরের ভেতর থেকে হাঁক পাড়েন, আর টালি ভাঙিস না।

ছেলেটি চালের ওপর সমানে কোদাল চালায়, হেঁইয়ো—মারো—হেঁইয়ো—

কোদাল আর থামে না।

জমিদার তারস্বরে চীৎকার করেন, গাল পাড়েন।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! মড়্মড়্ করে টালি ভেঙে পড়ে ঘরের মেঝেয়। গৃহিনী ও চীৎকার করে ওঠে। শেষটায় জমিদার নিজেই মই নিয়ে চালে উঠতে চেষ্টা করে। সবাই হাঁ হাঁ করে ওঠে। অমন ভারী শরীর চালের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়লে আর রক্ষে নেই।

ছেলেটি কোদাল চালাতে চালাতে জবাব দিলো, মাটি কোপানো হলে বীজ পুঁতে জল চালবো।

খবরদার বলছি। থাম শিগ্গির।

হেঁইয়ো—মারো কোপ—হেঁইয়ো।

ছোকরা, তোর মুণ্ডু থেতো করে দেবো।

আউর মারো—

ছোকরার দিকে একটি টালি ছুড়ে দিলো জমিদার। রাগতভাবে হাঁকলো, থাম। বাগান করতে হবে না তোকে। আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি।

ছেলেটি থামলো। জমিদার নেমে এলেন। খাজাঞ্চিবাবু ছেলেটির নামের পাশে মোটা টাকার মজুরী লিখে রাখলেন। খরচের খাতায় লিখলেন নতুন টালি কেনা ও লাগানোর জন্যে খরচ।

জমিদারের মাথায় হাত পড়লো! ছোকরাটি মহাপাজী শয়তান। আমার খাবে আর আমার সর্বনাশ করবে। সামান্য একটু কৃতজ্ঞতা নেই। ছি ছি। মানুষ এত নেমকহারাম হয় নাকি!

গৃহিনী বেশ খানিকক্ষণ গজ্‌গজ্‌ করলেন। খাজাঞ্চিবাবু বোঝালেন এই ছোকরার জন্যে খরচ বাড়ছে। একে মানে মানে বিদায় করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

জমিদারবাবু সব শোনার পর চুপ করে খানিকক্ষণ ভাবলেন। দুদিন কারো সঙ্গে কোন কথা কইলেন না। ছেলেটি বাড়ির কাজ কর্ম যেমন করে তেমনি করতে লাগলো।

সব যেমন চলছিল, তেমনি চলতে লাগলো।

কিছুদিন পর জমিদার ছোকরাটিকে ডেকে পাঠালেন, ওরে শোন, শরীর টরীর ভালো যাচ্ছে না। বেজায় গরম পড়েছে। মনে হচ্ছে এবার খরা হবে মানুষের খাওয়া জুটবে না।

আজ্ঞে, আমায় কী করতে হবে ?

আমার জমিতে ধানের চারাগুলো সবে মাথা চাড়া দিয়েছে। রোদে পুড়ে খাক হয়ে যাবে।

আজ্ঞে, তুলে নিয়ে আসবো।

আকাট, চুপ কর। তুলে নিয়ে লাভ কী হবে।

আজ্ঞে—

গাছ শুদ্ধ জমিটাকে ঘরে তুলে আন। ঘরের ফসল ঘরেই থাকবে। যদি না পারিস, তাহলে এতদিন তোর যত মজুরী জমেছে সব কেটে নিয়ে দূর করে দেবো—

আজ্ঞে, খুব পারবো আমি।

বেশ, তাহলে কাল থেকে কাজে নেমে পড়।

ছেলেটি চুপ করে রইলো। কপালে চিন্তার রেখা।

জমিদারের চোখে খুশির ঝিলিক।

পরের দিন আলো ফুটলো। ভোরের আলোয় ধানের চারা ঝলমল করছিলো। বাতাসে দুলছিলো গাছের নগা। ছেলেটি সারা মাঠ-ঘুরে ঘুরে দেখলো। তারপর ফিরে এলো ঘরে।

জমিদার দোতলার বারান্দায় বসে বসে সব দেখলো। মনটা তার বেজায় খুশি।

ছেলেটি ফিরে এসে জমিদারবাবুকে বললো, কিছু যন্ত্রপাতি চাই।

জমিদার খোস মেজাজেই ছিলেন, বললেন, বেশ—বেশ। যা দরকার নিয়ে নাও।

ছেলেটি হুকুম পেয়ে চলে গেলো।

জমিদার ফাঁকা ঘরে হো-হো করে হাসলো।

দুধবিহীন কালো-চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বেশ শব্দ করে বললেন, আহ্।

হঠাৎ এ কিসের শব্দ। বাড়ি কাঁপিয়ে ফেলছে।

ঠক্—ঠক্—ঠক্—

দুম্—দুম্—দুম্

ধড়াস্—

সর্বনাশ!

পড়ল কী!

দেওয়াল নাকি!

নাহ্। ওসব নয়।

কোন গাছ বোধ হয়।

জমিদার আবার চায়ে দিলেন চুমুক। ভারী তৃপ্তি। খুব আরাম। সুখ! হঠাৎ আবার একটা শব্দ। পড়লো একটা কিছু। হুঁ। কিছু একটা বটেই। ছোঁড়াটার মতিগতি ভালো নয়। চাইলো যন্ত্র-পাতি—তাই শব্দ হয়। আবার কিছু ভাঙছে? সর্বনাশ! মাথায় বাজ হানছে।

উঠে দেখি!

জমিদার পেয়ালা ছেড়ে উঠলেন। গৃহিনী তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে প্রায় কেঁদে কেঁদে বললেন, লোকে পয়সা খরচ করে কাজের লোক রাখে, আর তুমি কোথা থেকে ঐ সর্বনেশে ছোঁড়াকে এনেছো। ঘর-দোর ভেঙে দুখানা করে দিলে!

তাই বুঝি? তারই শব্দ?

হ্যাঁগো—হ্যাঁ, তারই শব্দ।

বুনোশুয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোৎ করে করতে করতে, পাগলা হাতির মতো রাগে মোটা পা দুটো থপ্ থপ্ করে ফেলতে ফেলতে নীচে নেমে এলো।

ছেলেটি তখন সদর-দরজা মড় মড় করে ভেঙে ফেলছে।

জমিদারের শরীরে সমস্ত রক্ত তীব্র বেগে ছুটে এলো তার মাথায়। বিকট চীৎকার করে বলে উঠলেন, থাম, বদমায়েস, শয়তান, ছুঁচো, কুকুর— এবং চাষার ছেলে।

কাজ করতে করতে সংক্ষিপ্ত ও সংযতভাবে জবাব দিলো ছেলেটি।

বটে! আবার মুখের ওপর চোপা! ওরে কে আছিস। ওকে ধরে আন আমার কাছে।

কিন্তু কেউ তাকে ধরতে সাহস করলো না। সে একইভাবে দেওয়াল ভাঙতে শুরু করলো। তখন জমিদার বাধ্য হয় বললেন, তোকে আমার কাজ করতে হবে না। চারা গাছ রোদে পুড়ে খাক হয়ে যাক।

ছেলেটি থামলো। হাতের সাবল ঠং করে মাটিতে ফেললো।

জমিদার তার ভারী শরীরটাকে রাখলেন একটি চেয়ারে। তারপর হাঁক দিলেন, খাজাঞ্চিবাবু, ওপর থেকে খাতা এনে ওর হিসেবটা চুকিয়ে দিন ও আমার বাড়ি থেকে দূর হোক। যদি আর কিছুদিন ও আমার বাড়িতে থাকে, তাহলে আমার প্রাণটা রাখা দায় হবে।

খাজাঞ্চিবাবু হিসেব করে সমস্ত পাওনা টাকা মিটিয়ে দিলো। ছেলেটি টাকাগুলো ট্যাকে গুঁজে মনের সুখে গান গাইতে বাড়ি ফিরলো।

সে অনেক অনেক—দিন আগেকার কথা।

হুতু গেমুহু নামে এক রাজা ছিলেন।

তার একটি মাত্র ছেলে। যেমন তার রূপ তেমনি । রাজা মনে মনে ছেলেয় সম্বন্ধে ভারী গর্ব করতে থাকেন।

ছেলের নাম শালীয়।

দিন যায় মাস যায় বছর যায়।
শালীয় ধীরে ধীরে বড় হয়। শরীর বাড়ে।
রাজকুমাদের শালীয় যৌবনে এসে পৌছায়।

একদিন রাজকুমার তার প্রিয় হাতীটিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। রাজ-ধানীর পথ ছেড়ে হাতীটি বনের পথ ধরলো। চারিদিকে ঘন জঙ্গল। সূর্যের আলো ঢুকতে পায় না সেখানে। মাটি স্যাঁৎসেতে! জায়গা বেশ উচু।

রাজকুমাব শালীয়র পোষমানা হাতী জংগলের পথে এগিয়ে চলে। রাজকুমার বনের সবুজ শোভা দেখতে দেখতে এগিয়ে যায়। মন ভরে যায় তার।

হঠাৎ পাখীর স্বরের মত একটি মিষ্টি স্বর ভেসে এলো তার কানে। রাজ-কুমারের চমক ভাঙলো। এমন সুন্দর গান সে কখনো শোনে নি! রাজ সভায় ওস্তাদের গান অনেক শুনেছে। রাজনর্ত্তকীর গানও শুনেছে। এমন প্রাণভরা গান সে গান নয়। এ গানে যেন যাদু আছে।

কৌতূহলী রাজকুমার প্রিয় হাতীটির পিঠে বসে সেই প্রাণ মাতানো গান শুনতে শুনতে এগিয়ে চলে। বনের মধ্যে নানা রঙের ফুল ফুটেছে কী বিচিত্র তার শোভা। লাল, হলুদ, বেগুনী কমলা, সোনালী, নানা রঙ। কত আকারের ফুল। কোন কোনটি বেশ ছোট, রাজরাণীর ছোট হারে হীরের ছোট লকেটের মত, সবুজ পাতার কোলে দোল খাচ্ছে। কোন কোনটি লালের গুচ্ছ। কে যেন রক্তের রঙ ছিটিয়ে দিয়েছে। আর হলুদের কী উজ্জ্বলতা।

পাতার আড়াল থেকে রাজকুমারের চোখে পড়ে এক আশ্চর্য দৃশ্য! রাজ-কুমারের চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে ওঠে। একী! এমন স্বর্গীয় সৌন্দর্য এই বনভূমিতে কে নিয়ে এলো! রাজকুমার হাতীর পিঠ থেকে নেমে পড়লো। হাতীটিকে সেইখানে রেখে অতি সন্তর্পণে আড়াল থেকে দেখতে লাগলো।

যেন মাটির তৈরী কোন প্রতিমা। গায়ের রঙে সোনার উজ্জ্বলতা ছিল না। দুধে-আলতা মেশানো রঙের মদিরতা ছিল না। যেন কেউ উজ্জ্বল তামার পিণ্ডকে খোদাই করে এই অপরূপ মূর্তি নির্মাণ করেছেন। চোখের দৃষ্টিতে সরলতা, মুখে লাবণ্যের জোয়ার, শরীরে যৌবনের ঢেউ। স্বল্পবাক বনদেবীর মতই যেন বনের বিচিত্র ফুলগুলিকে সস্নেহে গান শুনিয়ে যাচ্ছে।

রাজকুমার কখন হাঁটতে হাঁটতে ওর সামনে এসে পড়েছিল। বনদেবীর চোখে চোখ পড়তেই রাজকুমার প্রশ্ন করলো, কে তুমি?

মেয়েটি তাকালো রাজকুমারের দিকে।

আমি উপজাতি-মেয়ে। এই আমার পরিচয়।

রাজকুমার নিবিড় সান্নিধ্যে এসে পড়েছিলো প্রায়।

মেয়েটি সলজ্জভঙ্গীতে জবাব দিলো, অপরাধ নেবেন না। সাবধান করে দিই, আপনি কাছে এগোবেন না! আমরা নীচ জাতি। শহরের আলো আমাদের এখানে এসে পৌছলে আমাদের অকল্যাণ হবে! আপনি সরে যান!

রাজকুমারের কৌতুহল বাড়লো। সে বললো, তুমি তো নারী।

মেয়েটি মাথা নাড়লো।

রাজকুমার বললো, বনের ধারে একটু বসি। তুমিও বোসো।

মেয়েটি দ্বিধায় আড়ষ্ট হয়ে বসলো।

রাজকুমার ওদের উপজাতি সম্পর্কে অনেক কথা জানতে চাইলো। কৌতুহল দেখালো।

মেয়েটি তাদের সমাজের নানা কথা বললো। কেমন করে দুঃখের সঙ্গে লড়াই করে ওদের জীবন কাটে। চাষবাস অতি সামান্য। বনের ফলমূল, আর সামান্য আনাজ-পত্র যা ফলে তাতেই ওদের জীবন চলে যায়। বনের ফুলে সাজে।

শালীয় প্রশ্ন করে, রাজার লোক এখানে আসে।

আমি জানি না।

সে কী! তুমি কোন খবরই রাখো না?

নাঃ। বলেই মেয়েটি মাথা দোলালো।

রাজকুমার বললো, তোমাদের এখানে পথঘাট তৈরী করা, চাষবাসের উন্নতি-এ-সব রাজার লোকে করে না?

কই না তো! হাসিতে ফেটে পড়ে জবাব দেয়। আমাদের আবার রাজা কোথায়? মুরুব্বি মাঝে মাঝে বাপের সঙ্গে কোথায় যেন যায়। বনের প্রচুর জিনিসপত্র নিয়ে যায়। সব মানুষের জমায়েতে জমিয়ে গল্প করে। রাজ বাড়ি দেখেছে, হাতী ঘোড়া দেখেছে, কত সুন্দর সুন্দর মানুষ বাড়ি ঘর······বলতে

মুরুব্বির চোখ দুটো জলে ভরে আসে। দুঃখ করে বলে, আমাদের কিছুই নেই। তারপর বলতে থাকে, ওসব জিনিস, ঐশ্বয্যি পাপ, নোংরা। ওসব আমাদের জংগলে ঢুকলে জংগল সাফ হয়ে যাবে। সমুদ্দুর শুকিয়ে যাবে। বন মরুভূমি হয়ে যাবে। আকাশ থেকে আগুন ঝরে পড়বে। আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবো।

একসঙ্গে এত কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে পড়েছিল। তবু প্রশ্ন করলো, তুমি কে? এখানে এলে কেমন করে?

রাজকুমার শালীয় পরিচয় গোপন করলো। সে বললো। আমি তোমারই মত একজন হতভাগ্য, একদল বণিক আমাকে জংগলের ধারে ফেলে পালিয়ে যায়। বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে আমি তোমার গান শুনে এসে পড়লাম তোমার সামনে।

তুমি ফিরবে না?

কোথায় আর ফিরবো বলো।

তাহলে?

তোমাদের এখানেই থেকে যাবো।

মেয়েটি অবাক হলো। এ কোন্ বিদেশী তার কাছে অতিথি হয়ে এলো। মেয়েটি তাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরলো।

পথে যেতে যেতে মেয়েটিকে প্রশ্ন করলো রাজকুমার, তোমার নামটাতো শোনা হলো না?

—কি হবে আমার নাম জেনে?

বলবে না তো? বেশ, আমি তোমার নাম দিলাম অশোকমালা। অশোক ফুলের মতই সুন্দর তুমি।

মেয়েটি হো হো করে হেসে উঠলো।

দিবাকর অস্ত গেলো।

উপজাতি পল্লীতে রাজকুমার অতিথি। ওদের প্রথানুসারে ওরা বনের ফল আর পশুর মাংস দিয়ে রাজকুমারকে অভ্যর্থনা জানালো। ওদের বিশেষ নাচ আর গানে অতিথিকে সম্মান জানালো। অশোকমালা নাচে নি।

ভোর না হতেই উপজাতিদের জীবন শুরু হয়ে যায়। মেয়ে-পুরুষে মিলে বনের কাঠ কাটে, ফল সংগ্রহ করে, মাটি কুপিয়ে মাটির ভেতরের ফসল আনে। শালীয়ও ওদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান করে, ওদেরই মত পরিশ্রম করে। শালীয় ক্রমে ওদের আপন-জন-হয়ে ওঠে। অশোকমালার ওকে মনে ধরে যায়। শালীয়ও মনে মনে তাই চেয়েছিল। দুজনের মনের কথা জানতে পেরে একদিন মুরুব্বি ওদের বিয়ে দিয়ে দিলো। সবাই মিলে ওর ঘর ছেয়ে দিলো। পাতার ছাউনি, কাঠের ঘর। পাথরের মেঝেয় পাতার বিছানায় নবদম্পতির রাত কাটলো সুখে।

এদিকে রাজপ্রাসাদে সোর গোল পড়ে গেছে।

যুবরাজ শালীয় নিখোঁজ।

রাজার হুকুমে দলে দলে সেপাই, লোকজন, গুপ্তচর বেরিয়ে পড়েছে রাজকুমারের খোঁজে। হৈ হৈ ব্যাপার। রাজকুমার গেল কোথায়? রাণীর চোখে ঘুম নেই। রাজার চোখে ঘুম নেই। ঘুম নেই রাজ্যের লোকের।

কিন্তু কোথায় রাজকুমার।

সবাই ফিরে আসে ভগ্নদূতের মতো।

রাজা ক্ষিপ্ত। বললেন, যেভাবেই হোক রাজপুত্রের সংবাদ আনতেই হবে। মহামন্ত্রী প্রমাদ গণলেন। গুপ্তচরদের ডেকে বললেন, পাহাড়-জংগল, আদিবাসী পল্লী কোথাও বাকী রাখবে না। সব জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজে আনবে।

আবার লোকজন বেরিয়ে পড়লো হৈ হৈ করে।

খুঁজতে খুঁজতে একদল বনের মধ্যে ঢুকে পড়লো। ভয়ে ভয়ে এগোতে ওদের চোখে পড়লো হাতী। এসে হাজির হলো হাতীর কাছে। বটে! এতো রাজকুমার শালীয়র সেই প্রিয় হাতি। তাহলে কাছাকাছি কোন জায়গায় নিশ্চয়ই রাজকুমার আছে। হাতীটিকে ওরা সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে এলো উপজাতি পল্লীতে। তখন রাজকুমার শালীয় একটি বড়ো গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করছে। অশোকমালা তার পাশে বসে একটি ফলের খোসা ছাড়িয়ে দিচ্ছে। রাজার লোকজন ছুটে গেল তার কাছে। করযোড়ে মিনতি

করলো, রাজপুত্র, আপনার ফিরতে আজ্ঞা হোক। মহারাজ বড় উদ্বিগ্ন। রাণীমা কাঁদছেন।

রাজকুমার শালীয় স্পষ্ট জবাব দিলেন, আমার পক্ষে ফেরা সম্ভব নয়।

রাজার লোকজন অনেক অনুনয় করলো। রাজবাড়ির পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললো, তবুও রাজকুমারের মন টলাতে পারলো না। অবশেষে বিষণ্ন মনে ওরা ফিরে গেল।

উপজাতি কন্যা অশোকমালার কাছে রাজকুমারের প্রকৃত পরিচয় আর গোপন রইলোনা। মিথ্যা পরিচয় দেবার জন্য রাজকুমারের বিরুদ্ধে অশোকমালা কিছু অনুযোগ করলো। অভিমান করলো। দু-দিন কথাবার্তাও হলো না দুজনের মধ্যে।

রাজকুমার শালীয় ওকে বুঝিয়ে বললো, তোমাকে পাবো বলেই আমার এই ছলনা অন্য কোন উদ্দেশ্য আমার ছিল না। প্রথম যখন গাছের আড়াল থেকে তোমাকে দেখি, তখনই আমার ভালো লাগে।

এই ভালো লাগার জন্যে তুমি রাজ্য, রাজপ্রাসাদ, বাবা-মা সকলকে পরিত্যাগ করবে? কঠিন-প্রশ্ন উচ্চারণ করলো অশোকমালা।

রাজকুমার শালীয় চিন্তিত।

আমি কি সকলের চেয়ে বড়ো? অশোকমালা বললো।

রাজকুমারের মুখে কোন জবাব নেই। মাথা নত করে আছে সে। উপজাতি কন্যা অশোকমালার এ কী প্রশ্ন! রাজকুমার শালীয় তার সমাজ-পরিবেশ, পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে এ কোথায় বাস করছে? বিপুল সম্পদ, আরাম, বিলাস ছেড়ে এ কৃচ্ছ সাধনের অর্থ কী? নিজের কাছেই প্রশ্ন ফিরে আসে কুমারের মন থেকে। কোন জবাব তার জানা নেই। কোন যুক্তি তার মাথায় আসে না। শুধু মনে পড়ে এই উপজাতির কতকগুলি মানুষ কত সরল। যার কুল, মান, পরিচয় জানা নেই তার হাতে তাদের মেয়েকে সঁপে দিলো কিভাবে? এমন আপন করে নিতে পারলো কোন গুণে। এদের আকাঙ্ক্ষা নেই, ভালোবাসা আছে। এরা পেতে চায় না। দিতে চায়। আর এদের এই দানকে অসম্মান করা পাপ। শালীয় মনে মনে ঠিক করে ফেললো, যদি মহারাজ অশোকমালাকে পুত্রবধূ রূপে মেনে নেয়, তবেই সে রাজধানীতে ফিরে যাবে। নইলে তার ফেরা সম্ভব নয়। তার মনের কথা

অশোকমালা জানলো না।

রাজার প্রাসাদে সূর্যের সোনালী আলোর ছটা এসে লাগলো। রামধনুর সাত রঙ যেন শ্বেত পাথরের ওপর হোলির রঙ ঢেলে দিলো। দেবমন্দিরে পূজার ঘন্টা বাজলো। গৃহস্থ লোকেরা হাটেবাজারে পণ্য সংগ্রহে ব্যস্ত। সকলের মুখে একই প্রশ্ন—কুমার বাহাদুর গেল কোথায়? অদৃশ্য হয়ে গেলো নাকি? রাজ্যে এত সেপাই, এত গুপ্তচর এত লোকজন, রাজকুমারের কোন খবর আনতে পারে না। সব হাড়ে হাড়ে বজ্জাত। অকর্মণ্যের দল।

এমন সময় হুদ্দাড় করে রাজার লোকজন ঘোড়ার চড়ে বাজারের পথ ধরে প্রাসাদের মুখে যাচ্ছিল। আরোহিদের মুখ পাংশু। বেশ গম্ভীর। কারুর বুঝতে বাকী রইলো না, সংবাদ ভালো নয়। ভয়ে কেউ কোন মন্তব্য করলো না। যে যার কাজ সেরে বাড়ি ফিরে গেলো।

সিংহাসন উজ্জ্বল করে রাজা বসেছিলেন। তাঁকে ঘিরে বসে ছিলেন অমাত্য ও পরিষদ বর্গ। সকলের মুখেই বিষন্নতার ছাপ। সকলেই উদ্বিগ্ন।

একজন এসে বার্তা দিলো, মহারাজ, কিছু নিবেদন আছে। বলতে আজ্ঞা হোক।

বেশ, বলো।

বার্তাবাহক বললো, মহারজ, কুমারের সন্ধান পাওয়া গেছে।

সে ফিরেছে। কোথায় সে?

আজ্ঞে না, কুমার ফেরেন নি।

ফেরেন নি?

আজ্ঞে না, আমাদের লোকজন 'কুমারের' কাছে রাজবাড়ির সকল পরিস্থিতি নিয়ে ফেরার অনুরোধ করলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

প্রত্যাখ্যান?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি আর কখনও ফিরবেন না, একথাও জানিয়ে য়ছেন?

কী আস্পর্ধা দুগ্ধপোষ্য বালকের।

মহারাজ অস্থির হয়ে উঠলেন। জানতে চাইলেন রাজকুমার কোথায় আত্ম-পন করেছেন। বার্তাবাহক মহারাজের কাছে সব কথাই বললেন। রাজা ।.·হয়ে উঠলেন। নিজেই উপজাতি পল্লীতে যেতে চাইলেন। কিন্তু

মহামন্ত্রীর পরামর্শে তিনি ক্ষান্ত হলেন। ঠিক হলো মহামন্ত্রী লোকজনসহ নিজেই অভিযান করবেন এবং বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজকুমারকে ফিরিয়ে আনবেন।

কিন্তু তার সে চেষ্টা ফলবতী হলোনা। রাজকুমার কিছুতেই ফিরলেন না। মহামন্ত্রীর অনুরোধও রাখলেন না কুমার। বিষণ্ণ মুখে ওরা সবাই ফিরলেন।

এ সংবাদে রাজা ক্ষুব্ধ হলেন। নিজেই অভিযান করলেন। বনের মুখে সৈন্য-সামন্ত রেখে কিছু নিজস্ব লোকজনও মহামন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজ উপজাতি পল্লীতে প্রবেশ করলেন। অশোকমালা বনের ফুল সংগ্রহ করে মালা গাঁথছিল। মহারাজকে দেখেই বেশ ভয় পেয়ে ছুটে গিয়ে ঢুকলো পাতার কুটিরে। অল্প-কাল পরে ঐ কুটির থেকেই রাজকুমার শালীয় বেরিয়ে এলো। মহারাজকে দেখে এতটুকু বিস্ময় প্রকাশ না করে শান্তভাবে তাঁকে প্রণাম করলেন। মহারাজ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দুই চোখে তার আনন্দাশ্রু।

মহারাজ বললেন, এবার বাড়ি ফিরে চল। তোর মা কেঁদে কেঁদে সারা।

রাজকুমার শালীয় শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন, ন, বাবা, আমার পক্ষে আর ফেরা সম্ভব নয়।

কেন? কি হয়েছে তোর? কীসের তোর অভিমান?

আমি বিয়ে করেছি উপজাতি কন্যা অশোকমালাকে।

সে বিয়ে প্রত্যাখ্যান করা যায়।

না, আমি পারবো না।

পারতেই হবে শালীয়! তুই যে আমার একমাত্র ছেলে। শিবরাত্রির সলতে। সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী। তুই না ফিরলে সিংহাসন শূন্য থাকবে।

ফিরতে পারি এক শর্তে।

শর্তে? মহারাজ চমকে উঠলেন। কিসের শর্ত!

অশোকমালাকে রাজবধু হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

সে কি সম্ভব? আমাদের বংশে চিরচরিত প্রথায় উপজাতি কন্যা কখনই রাজবধু হবার যোগ্য নয়।

তবু আমার অনুরোধ!

শালীয়। তুই বুদ্ধিমান। তোকে বুঝিয়ে বলার বিশেষ দরকার হবে না।

আমাদের বংশে উপজাতি-কন্যা গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

তবে আমি ফিরবো না।

সিংহাসন গ্রহণ করার জন্যেও তোকে উপজাতি-বধূ পরিত্যাগ করতে হবে।

আমি তা পারবো না।

কিন্তু কেন?

রাজ্যের কল্যাণের স্বার্থে।

কি রকম।

রাজসিংহাসন তো সকলের আশীর্বাদে পবিত্র থাকে। রাজ্যের মধ্যে উপজাতিরা যদি বর্জনীয় হয়, আপাংক্তেয় হয় তবে সে পাপের সিংহাসনে আমি বসতে চাইনা।

মহারাজ ক্ষুব্ধ হলেন। শালীয়কে অনেক বোঝালেন। কিন্তু শালীয়র এক কথা। রাজ্যের সমস্ত প্রজারা সমান। সমান মর্যাদার অধিকারী। এই চেতনা থাকলে রাজ্যের শক্তি বাড়ে। সম্পদ বাড়ে। বাইরের শত্রু এ রাজ্য আক্রমণ করতে সাহস পাবে না। উপজাতির লোকেদের মনে রাজার জন্য কোন শ্রদ্ধা নেই। কোন ভালবাসা নেই।

আরো অনেক কথা শালীয় বললেন।

মহারাজ বললেন, বেশ, তাহলে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করলাম। :শের প্রথানুসারে তুমি আর এই রাজ্যের সিংহাসনের অধিকারী রইলে না। ামার মৃত্যুর পর এই সিংহাসনের অধিকারী হবেন আমারই কনিষ্ঠভ্রাতা ত্মু।

শালীয় শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, বেশ, তাই হোক। আমার বিবাহ যদি শের সকল মানুষের মন থেকে ভেদাভেদের প্রাচীর ভেঙে দিতে পারে, তাহলে ামার এই ত্যাগও সার্থক মনে করবো।

মহারাজ প্রথাকে অস্বীকার করতে পারলেন না। পুত্রকে পরিত্যা করলেন। শুধু তাঁর শেষ ইচ্ছানুসারে বনের এই উপজাতি পল্লীতে এক প্রাসাদ তৈরী হলো। শালীয় আর অশোকমালা তাদের সুখের জীবন সেখা কাটাবেন।

ঐ প্রাসাদ ঐক্যের প্রতীক হয়ে রইলো।

মানুষ যখন বেকায়দায় পড়ে তখন তার ভরসা হয় দেবতা। দুঃখের কথা তাকে জানানো ছাড়া আর উপায় কী! হায় আল্লা! তুমি ছাড়া আর দুনিয়ায় আমার কেই বা আছে বলো। তুমি দোয়া না করলে আমার মানব-জন্ম খতম্ হয়ে যাবে!

ইরাকের গরীব মানুষ নাসিরুদ্দীন। বেচারীর দিন কাটে দুঃখে। আয়পত্তর তেমন নেই। কাজে কাজেই এখন খোদার কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

কাক-ভোরে উঠে সে খোদার কাছে প্রার্থনা করে, হে আল্লা, তুমি বেহেস্তে

বসে দুনিয়ার সুবিধা আর সুখ ভোগ করছো। আমি এখানে না খেয়ে মরছি এ
তোমার কি রকম বিচার। আমাকে দোয়া কর। আমাকে একশো আশরফি
দাও। একটি কম দিলেও আমি নেবো।

রোজই এ রকম প্রার্থনা করে।

ভোর কেটে বেলা হয়। কিন্তু একশো আশরফি তো দূরের কথা। এক
আশরফিও মেলে না। দুঃখের কপাল। ভোরের প্রার্থনা আল্লার কানে
পৌঁছয় না।

কিন্তু নাসিরুদ্দীনের এক পড়শী বণিকের কানে যায়। রোজই এমন চীৎকার
শুনে লোকটার বেজায় বিরক্তি! বটে! এমন কাক ভোরে আল্লার কাছে
প্রার্থনার নাম করে পড়শীর ঘুমের ব্যাঘাত করা! বজ্জাত কোথাকার! দাঁড়া
তোর মজা দেখাচ্ছি।

রোজকার মতো নাসিরুদ্দীন ভোরে উঠেই প্রার্থনা শুরু করলো। আর
অমনি পড়শী বণিক একটা কালো থলিতে মুড়ে কিছু আশরফি ওর জানলার ফাঁক
দিয়ে ছুঁড়ে দিল ঘরের ভেতর।

প্রার্থনা শেষ করেই নাসিরুদ্দীন দেখলো কালো থলিতে মোড়া কী একটা
ভারী বস্তু পড়ে রয়েছে। সে তাড়াতাড়ি এসে তুলে নিলো। থলি খুলে
দেখলো তাতে রয়েছে আশরফি। আল্লাকে শ'বার ধন্যবাদ জানিয়ে আশরফি
গুনতে লাগলো। এক, দুই, তিন···· নিরানব্বই! হায় আল্লা! তুমি
গরীবের কথা ঠিক শুনেছ। তোমার ভাঁড়ারেও এখন ঘাটতি আছে। ব
বেশ। তা বেশ। আমি এতেই খুশি। তোমার সুবিধে হলে তুমি আর
একটা আশরফি নিশ্চয়ই ছুঁড়ে দেবে। বহুৎ মেহেরবানি তোমার। বহু
মেহেরবানি।

এদিকে নাসিরুদ্দীনের এসব কথাবার্তা শুনে পড়শীর চোখ ছানাবড়া।
বটে! ব্যাটা কম শয়তান নয় তো! এইমাত্র চীৎকার চলছিলো একশো
আশরফির একটা কম দিলেও সে নেবে না। ফিরিয়ে দেবে। আর হাতে
কাছে নিরানব্বইখানা পেয়েই মতলব ঘুরে গেলো। ব্যাটা হাড় বজ্জাত তো
তাহলে আমার নিরানব্বইখানা আশরফি বে-হাত হয়ে যাবে। বটে!

নাসিরের দরজায় এসে হানা দিলো সে।

খট্—খট্—খট্—খট্—খট্—

ভেতর থেকে নাসির সাড়া দিলো, কে? আল্লা নাকি!

বণিক মনে মনে বললো, আল্লা নই। তোমার যম।

নাসির দরজা খুলে একগাল হেসে বললো, আরে, বণিক ভায়া যে! আমার কী বরাত। ভোরে আল্লার দোয়া, আর দরজা খুলেই তোমার দেখা। আজকে আমার কপাল ভালো।

কেন? আল্লা আবার তোমায় কি দিলো!

নিরানব্বই আশরফি। আরও একটা দেবে।

বুদ্ধু কোথাকার। আল্লা তোমায় আশরফি দিয়েছে?

আলবাৎ। তিনি ছাড়া আর কে দেবেন! গরীবের দোস্ত তো তিনিই।

বটে! এতদিন জানতাম, তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। এখন দেখছি, তুমি একটা সাচ্চা বুদ্ধ। আল্লা তোমাকে বেহেস্ত থেকে আশরফির থলি ছুঁড়ে মারলো?

বটেই তো! জোর গলায় বললো নাসির।

মোটেই না। আমি ওটা ছুঁড়ে দিয়েছি তোমাকে পরখ করার জন্যে। ও আশরফি আমার। আমাকে ফিরিয়ে দাও।

নাসির পড়শী বণিকের কথায় হো হো করে হেসে উঠলো। ভারী চালাক তো ভায়া। আমি কখন প্রার্থনা করি, কখন খোদার দোয়া পেয়ে ধনী হই, এসব তুমি জানার জন্যে ওৎ পেতে থাকো। আর সুযোগ পেয়েই ধান্দা করতে এসেছো। সরে পড়ো দিকি! সরে পড়ো!

বণিক তো অবাক। রাগত ভাবে বললো, দেখো নাসির। পয়সা কড়ি নিয়ে ঠাট্টা তামাসা ভালো লাগে না। আমার আশরফি আমায় ফিরিয়ে দাও। নইলে ভালো হবে না কিন্তু।

নাসিরের জবাব, ওটা আল্লার দান। কোন্ দুঃখে তোমায় ফিরিয়ে দেবো। সরে পড়ো মানে মানে।

বণিক ছাড়বার পাত্র নয়।

নাসির ও দমবার পাত্র নয়।

তুমুল তর্কবিতর্ক! কথা কাটাকাটি।

শেষটায় ঠিক হলো, কাজীর কাছে যাওয়া হবে বিচারের জন্যে। নাসিরের

তাতে কোন আপত্তি নেই। তবে গোলমাল দেখা দিলো নাসিরের পায়ে সে বললো, দেখো বণিক ভায়া, আমার পায়ে ভীষণ ব্যথা। এতখানি পথ হেঁটে হেঁটে আমি কাজীর আদালত পর্যন্ত যেতে পারবো না। তুমি আমার জন্যে একটা গাধা ভাড়া করো।

কী আর করে বেচারা বণিক। একটা গাধা ভাড়া করলো। নাসিরুদ্দীন গাধার পিঠে চড়ে বললো, দেখ ভায়া, আমার জোব্বাখানা তেমন ভালো নয়। এভাবে গেলে তোমাকে লোকে মন্দ ভাববে। একটা ভালো জোব্বা—

থামো। ঘর থেকে একটা ভালো জোব্বা আনছি।

এই বলে বণিক ঘরের ভেতর থেকে নাসিরের জন্য একটা রেশমী জোব্বা নিয়ে এলো। নাসির সেটাকে গায়ে ছড়িয়ে খুশীতে ডগমগ করে বলে উঠলো, তোফা! খাসা জোব্বা এনেছো! তোমার রুচির তারিফ না করে পারছি না।

বণিক বললো। এবার চলো।

হ্যাঁ—হ্যাঁ। এবার তো রওনা হতেই হয়।

এই বলে নাসির একটু মাথা চুলকে বললো, আচ্ছা, বলতে পারো মানুষ সব কাজ করে মাথা খাটিয়ে, অথচ এই মাথার কথাটাই ভুলে যায় সব চেয়ে আগে।

তার মানে?

মানে হলো নিয়ে,—এই ধরনা গাধা নিলাম, জোব্বা পরলাম, কিন্তু মাথার পাগড়ী—দেখেছো-পাগড়ীর কথা বেমালুম ভুলে বসেচি। তা ভায়া, একটা সুন্দর পাগড়ী যোগাড় করো, নইলে যাবো কী করে।

নাসির! রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে থাকে বণিক।

নাসির বলে, রাগারাগি করলে তো চলবে না

তার মানে!

আমি আদালতে যাবো না। আদালতে নিয়ে যাওয়ার দায় তো তোমারই।

বেশ। পাগড়ী এনে দিচ্ছি।

অগত্যা বণিক তাকে একটা সুন্দর পাগড়ী এনে দিলো। নাসির পাগড়ী শিরোভূষণ করে বেশ বাদশাহী মেজাজে গাধার পিঠে চড়ে আদালত—মুখো হলো।

ঘণ্টা খানেকের পথ পার হলে ওরা এসে পৌঁছলো কাজীর আদালতে। বণিক ওর নামে নালিশ ঠুকলো। নিরানব্বুই আশরফি বেমালুম আত্মসাৎ করার অভিযোগে কাজী নাসিরুদ্দীনকে তলব করলেন। নাসিরুদ্দীন কাজীকে স্পষ্ট ভাষায় বললো, হুজুর, আমি নিরানব্বুই আশরফির মালেক। খোদা আমার ওপর মেহেরবানি করে সেই অর্থ দিয়েছেন। ফরিয়াদী বণিক ভায়া বলতে চাইছে, ওটা ওর। হুজুর, মালেক, আপনিই বিচার করুন, ওকি আমার খোদা?

বণিক রাগে গরগর করতে করতে বললো, হুজুর, ও মিথ্যে কথা বলছে।

নাসির জবাব দিলো, হুজুর, এরপর বণিক ভায়া বলবে। আমি যে সুন্দর জোব্বা পরে আছি, সেটারও মালিক উনি!

বণিক বললো, আজ্ঞে হাঁ হুজুর, ও জোব্বাও আমার!

হুজুর! দেখছেন আপনি। বণিকের লোভ কতখানি! এরপর উনি হয়ত বলতেন, আমার মাথার পাগড়ীখানাও ওনার।

বণিক সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, হুজুর, ধর্মাবতার, আপনি বিশ্বাস করুন ঐ পাগড়ীটাও আমার। নাসির ঠগ।

নাসির হাসতে হাসতে কাজীর দিকে চেয়ে বললো, দেখুন ধর্মাবতার, এবার বণিকভায়া নিশ্চয়ই বলবে, আমি যে গাধাটায় চড়ে আপনার আদালতে ন্যায় বিচার চাইতে এসেছি সেটাও ওনার—

বণিক হাঁ হাঁ করে বলে উঠলো আলবাৎ। হুজুর, ঐ গাধাটাও আমার।

নাসিরুদ্দীন বণিকের কথায় কাজীর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগলো। কাজী বণিকের ওপর বিরক্ত হয়ে মামলা খারিজ করে দিলেন এবং বণিককে তিরস্কার করে তাড়িয়ে দিলেন।

বণিক বিষণ্ণ মনে ফিরে গেল বাড়িতে।

বিজয়গর্বে নাসিরুদ্দীনও ফিরলো।

সন্ধ্যেবেলায় নাসিরুদ্দীনের বাড়ীতে বণিক এলো। মুখ ভার-ভার। নাসির হাসতে হাসতে বললে, আল্লার দান, আর তোমার দান, সবই তোমায় ফিরিয়ে দিচ্ছি। গরীবের সঙ্গে রসিকতা করো না।
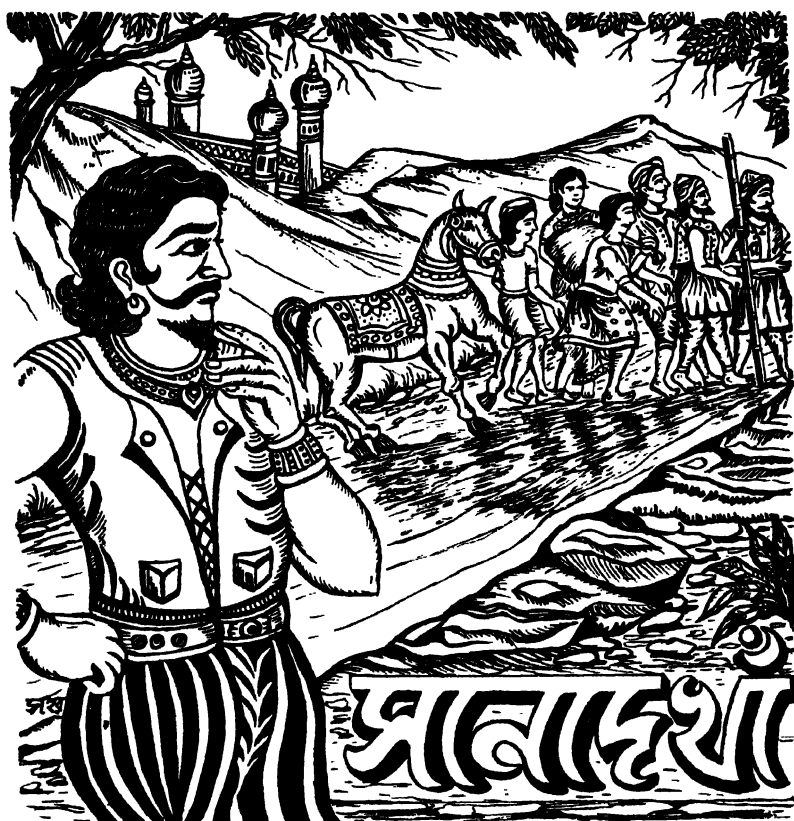
এবার একজন গোঁয়ার লোকের কথা বলি শোনো।

এশিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমে সে এক দেশ ছিল। সেখানে খানেরা বাস করত। ওরা এক একটা সময়ে এক এক জায়গায় থাকতো। তাই বলে ওদের যাযাবর বলা যাবে না। ওরা এখান-ওখান করে বেড়াতো গানের খেয়ালে। তাঁর

যখন ইচ্ছে হবে, তখনই সব লোকজনদের ডেকে বলবে, ওহে, তোমরা এবার সব লোটাকম্বল গুটিয়ে নাও। অমুক দেশে গিয়ে বাস করতে হবে।'

ব্যস। মুখের কথা খসামাত্রই সবাইকে তৈরী হয়ে নিতে হত। আসবাবপত্র সব পড়ে রইলো। কোনরকমে খাবার-দাবার যা কিছু ছিল কাপড় জামা যা ছিল—সব গোছগাছ করে ছেলেমেয়ের হাত ধরে, বুড়ো বুড়িদের সঙ্গে নিয়ে হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়লো। সঙ্গে নিলো ঘোড়া।

অন্যথা করবার মতো সাহস কোন লোকের ছিলো না।

এমন কি ফিস ফিস করে, কানে কানে গুন গুন করেও কোন প্রতিবাদ বা বিরক্তি প্রকাশ করার কোন উপায় ছিলো না।

কেউ যদি কোথাও এতটুকু অনিচ্ছা প্রকাশ করত, ব্যস, তাহলে আর যাবে কোথায়। খানের লোকজন এসে তাকে পাকড়াও করে নিয়ে গেলো। বিরাট লম্বা একটা তরবারি হাতে নিয়ে খানের ঘাতক তার মুণ্ডুটাকে দেহ থেকে নামিয়ে দিলো। দেহ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো।

কিন্তু কেউ এতটুকু কাঁদতে পারবে না। শোক করতে পারবে না।

বরং বলতে হবে, একজন বিশ্বাসঘাতক প্রজা খতম হলো।

খানের দেশে শান্তি এলো। পরের দিনগুলো সুখে কাটবে।

সেই খানেদের বংশের ছেলে সানাদ খান।

ইয়া লম্বা আর চওড়া তার দেহখানা। মাথায় বাদামী রং-এর চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসে লতিয়ে গেছে কাঁধের দুই পাশে। মুখের ওপর মোটা গোঁফ দীর্ঘ হতে হতে কান পর্যন্ত এগিয়ে আছে। আর চিবুকের ওপর থেকে কয়েকগুচ্ছ দাড়ি ঝুলছে।

চোখ দুটোতে হিংস্র বাঘের দৃষ্টি।

পরনে ভেড়ার চামড়ার ছোট জামা। চওড়া বুকটা সবসময় খোলা থাকতো এক ধরণের চাপা প্যাণ্ট, পড়ে থাকতো।

ওর দলবলের সবাই ওকে ভীষণ ভয় পেত। আর দেবতার মত ভক্তি করতো সেই ভয়েই। ওর যুক্তি ছিল অকাট্য।

একদিন সানাদ খানের ইচ্ছে হল সে দূর দেশে যাবে।

অনুচরকে বললে, যাও, প্রজাদের বলে যাও, আমরা এখন এদেশ ছেড়ে দূর দেশে যাবো। এদেশ আর ভালো লাগছে না। পৃথিবীর উত্তর পূর্ব দিকে রওনা হবো।

সামনে পড়বে পাহাড়, নদী, ঝরণা, মরুভূমি। বিচিত্র সব দেশ। কতরকমের মানুষ। আর কত বিচিত্র রকমের আপদ-বিপদ। সেগুলিকে তলোয়ারের আঘাতে কেটে টুকরো টুকরো করে এগিয়ে যাবে সানাদ আর তার লোকজন। মরুভূমিতে হয়ত উঠবে ধূলির ঝড়, আকাশের নীল চাঁদোয়া ঢেকে যাবে গাঢ় অন্ধকারে। অমাবস্যে রাত নেমে আসবে হঠাৎ। আর সানাদ তার তলোয়ার নিয়ে হুংকার ছাড়বে, সরে যাও বদমায়েশ, আমার পথ থেকে। ভয়ে বিবর্ণ ঝড় তার ভয়ংকর চেহারাটা সরিয়ে নেবে। আকাশের নীল উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

সানাদের লোকজন হি হি করে হাসবে।

সানাদের গর্বিত মুখে সূর্যের দীপ্তি দেখা দেবে।

ওর বিজয়-বাহিনী আবার এগিয়ে যাবে নতুন পথে, নতুন অভিযানে।

এমনি করেই চলবে তার বিজয়-অভিযান।

এদিকে সানাদের নতুন পরিকল্পনার কথা বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়েছে। দুপুরের কড়া রোদে তার সমস্ত প্রজা এসে জমায়েত হয়েছে পাহাড়ের কোলে। ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-মদ্দ—সব হাজির হয়েছে সানাদের নির্দেশ শুনতে। কী ফরমান জারী করে সে।

সবাই কাঁপছে থর থর করে।

বাতাস কাঁপাছে ভয়ে।

অনুচরেরা নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে।

সানাদ এলো ঘণ্টা খানেক পরে। কোমরে লটকানো খোলা তলোয়ার। দুই পাশে চারজন করে আটজন বলিষ্ঠ অনুচর।

সানাদের বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল।

আমার ইচ্ছে, এবার উত্তর পূর্বে অভিযান করবো। অনেক দূরের দেশ। পথে অনেক কষ্ট আছে। বুড়ো বুড়ি, মেয়েছেলে, আর কচি-কাচারা কেউ অভিযানে যাবে না।

সবাই বেশ খুশি যাক বাবা! বুড়োবুড়ি আর মেয়েছেলেদের ছেড়ে দিয়ে ভালোই করেছে। ওদের ভারী কষ্ট হয়। আর বাচ্ছারা তো আধমরা হয়ে যায়! এ বেশ ভালোই হলো।

সবাই হো-হো করে সানাদের নতুন প্রস্তাব সমর্থন করলো।

সানাদ খুশি মনে সবাইকে সাধুবাদ জানালো।

সে আবার বললো, এই সব বুড়োবুড়ি, কাচ্চা-বাচ্চা আর মেয়েদের কোতল করতে হবে। তিনদিন সময় দিলাম। কাজ শেষ কর।

নির্মম আদেশ!

যারা সভায় সানাদের কথা শুনতে এসেছিল তাদের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। একী বলছে সানাদ। বুড়ো-বাপ, বুড়িমা, নিজের বউ, ছেলেমেয়ে— এদের কি কেউ কখনও হত্যা করতে পারে! মানুষের জগতে এমন নির্মম কি কেউ কখনও থাকতে পারে!

একজন মৃদুভাবে বলল, আজ্ঞে নিজের বাপকে নিজের হাতে কোতল করবো কি করে?

সানাদ রক্ত বর্ণ চোখ তুলে তাকালো লোকটির দিকে। লোকট সঙ্গে সঙ্গে হায় হায় করলো। সানাদের অনুচর তাকে ধরে নিয়ে গেলো।

সানাদ জিজ্ঞেস করলো, তোর বাপ কই!

লোকটি ভয়ে ভয়ে বাপের দিকে ইঙ্গিত করলো।

সানাদের অনুচরেরা লোকটির বাপকে ধরে নিয়ে এলো।

বুড়ো বাপ থর থর করে কাঁপছে।

সানাদ হুকুম করলে, বাপের সামনে ছেলেকে কোতল করো।

যারা উপস্থিত হয়েছিল, ভয়ে শিউরে উঠলো। মাথা নীচু করলো।

জনতার সামনে বুড়ো বাপের সামনে যুবক ছেলেকে হত্যা করা হলো। সানাদ হুকুম করলে, আজ তোমরা চলে যাও। মনে থাকে যেন! আজ থেকে তিনদিনের মধ্যে হুকুম তামিল করতে হবে।

জনতা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরলো।

ভয়ে বুড়োবুড়িরা রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেল। মেয়েরা যে যেখানে

পারলো পালাতে চেষ্টা করলো। আর যুবকেরা নিজেদের প্রাণের মায়ায় কী ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হয়ে উঠলো।

নিজেয় বুড়ো বাপ, নিজের বউ, ছেলে মেয়ে—কেউ বাদ করলো না সানাদের কঠোর আদেশে মানুষ পিশাচ আর জল্লাদ হয়ে উঠলো।

তিন দিনে সব শেষ।

পাহাড়-তলীর রাজ্যের বুড়োবুড়ি সাফ হয়ে গেছে। মেয়েদের রক্তে নদী বয়েছে। কাচ্চা-বাচ্চার চীৎকারে আকাশ কেঁপে উঠলো। আর সানাদ তখন একগুচ্ছ আঙুর হাতে নিযে একটা করে গালে ফেলছিল টুপ টুপ করে।

ঘরেয় কোলে বসে একটি লোক মৃদু স্বরে গান গাইছিল। সানাদ পা দুলিয়ে দুলিয়ে তা শুনছিল আর খাচ্ছিল।

বাইরে তখন অঝোরে বৃষ্টি।

প্রকৃতি যেন কাঁদছে—বুক ভাঙা কান্না।

তিন দিন পরে তাদের যাত্রা শুরু।

বেশ শক্ত সমর্থ ঘোড়াগুলোকে তৈরী রাখা হলো। যুবকেরা যে যার মাল পত্তর গুছিয়ে নিলো। কারো মুখে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই!

একটি যুবকের নাম জাইরেন। সে তার বাবাকে হত্যা করেনি। গুহার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। রাতের অন্ধকারে একটা বস্তার মধ্যে বাবাকে ভরে নিয়ে চাপালো ঘোড়ার পিঠে। নিজেও উঠলো ঘোড়ায়।

সানাদের বাহিনী একে একে চলছিলো।

ধীরে ধীরে পূবের আকাশের সূর্য মাথার ওপর উঠলো। আবার ধীরে ধীরে পশ্চিমে ঢলে পড়লো। মাঠ-ঘাট-অরণ্য পাহাড় আর ঘোড়ার মাথা ডিঙিয়ে তার লাল রঙ ছড়িয়ে পড়লো।

নেমে এলো অন্ধকার। ঘুট ঘুটে অন্ধকারে ওরা তাঁবু খাটিয়ে থাকলো।

জাইরেন বস্তার মুখটা খুলে ওর বাবাকে বের করলো! হাত ধরে ধরে একটা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে রাখলো। অন্ধকারে তাকে খেতে দিলো আধখানা রুটি আর একটু জল।

বুড়ো নিঃশব্দে সেগুলি খেলো।

খোলা হাওয়ায় খানিকক্ষণ থেকে সুস্থ হয়ে নিলো। খোলা মাঠের ওপর বাপ-ছেলে খানিকটা ঘুমিয়ে নিলো। তারপর সে তার বাপকে বস্তার মধ্যে ভরে তাঁবুর মধ্যে নিয়ে এলো।

সকালের সূর্য উঠলো প্রতিদিনের মতো।

সানাদের অভিযান শুরু হয়ে গেলো।

চলতে চলতে তারা অনেক দূর গেলো। এসে পৌঁছলো সাগরের তীরে। আর সাগরের গা ঘেঁষে খাড়া উঠেছে পাহাড়। পাহাড়ে কোন গাছ পালা নেই। ধূসর পাহাড়ের ওপর বিকেলের রোদ পড়ে সোনার রঙ ধরলো।

সবাই তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম করলো রাতটা!

ভোর হোল।

একটি লোক সমুদ্রের ধারে গিয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলো। সমুদ্রের জলের ওপর একটা সোনার কাপ ভাসছে। একবার উঠছে আর একবার ডুবে যাচ্ছে। ভারী অবাক হলো সে। ছুটে এলো সানাদের কাছে, বললো হুজুর, একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম সাগরের জলে।

সানাদ জানতে চাইলো, কী।

লোকটি যা যা দেখেছে সব বললো সানাদের কাছে।

সানাদের লোভী চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠলো।

সে হুকুম করলো, যাও। ওটা নিয়ে এসো আমার জন্যে।

লোকটি হতভম্ব। সোনার কাপ সে সাগরের বুক থেকে কী করে নিয়ে আসবে! কিন্তু কীই বা সে করে। সানাদের যখন হুকুম হয়েছে, তখন তামিল করতেই হবে। তবু ঐ কাপটি আনার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। কাপ না নিয়ে ফিরলে গর্দান যাবে। লোকটি সাগরের তীরে এসে অনেকক্ষণ ভাবলো, কী করা যায়। কী করে ঐ সোনার কাপটি হাতের নাগলে পাওয়া যায়! পাহাড়ে উঠলো সে। খানিক উঁচু জায়গা থেকে লাফ দিলো সাগরের জলে। আর সে উঠলো না।

এদিকে সানাদ অস্থির হয়ে উঠছে। সোনার কাপ তার চাই।

অপরজনকে হুকুম করলো। সে আর ফিরলো না।

এইভাবে একে একে অনেকে গেলো, আর ফিরলো না।

এবার জাইরেনের পালা। সে বস্তার কাছে মুখটা নিয়ে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি করি বলে দাও।

এই বলে সে সোনার কাপের কাহিনীটি সংক্ষেপে বললো।

তার বাবা শুনলো। খানিকক্ষণ চিন্তা করে জাইরেনকে বললো, এক কাজ করো। আমার মনে হয়, সাগরের বিপরীত দিকে কোন পাহাড়ের ওপর সোনার কাপটি বসানো আছে। তারই প্রতিফলন হচ্ছে সাগরের জলে তুমি ঐ পাহাড়ে উঠে সোনার কাপটি নিয়ে এসে খানকে দাও গে।

জাইরেন বেরিয়ে পড়লো। সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে দেখলো সত্যিই সে অপূর্ব দৃশ্য। সমুদ্রের নীল জলের ওপর সোনার কাপটি ভাসছে যেন। অনেকক্ষণ ধরে দেখলো দৃশ্যটা। তারপরে বেশ কিছু দূরে গিয়ে দেখলো তার বাবার কথাই সত্যি।

পাহাড়ের চূড়ায় একটা বিশাল সোনার কাপ বসানো আছে। জাইরেন অতি উৎসাহে পাহাড়ে উঠতে লাগলো। অতিকষ্টে সে চূড়ায় উঠে সোনার কাপটি নিয়ে এসে দাঁড়ালো সানাদের কাছে!

তার সামনে কাপটি মাটিতে রেখে বললো, হুজুর, এটা নিন।

সানাদ কাপটি হাতে নিয়ে দেখলো। কী সুন্দর কাপটা।

কী অপূর্ব কারুকার্য! জিজ্ঞেস করলো জাইরেনকে, তুমি এটা আনলে কি করে?

জাইরেনের মনে পড়লো তার বাবার পরামর্শের কথা। কিন্তু সে কথা গোপন করে সে বললো, হুজুর, অতি কষ্টে সাগর ছেঁচে ঐ কাপটি এনেছি।

সানাদ তাকে এক ছড়া আঙুর ছুড়ে দিয়ে বললো, যাও।

সে রাতটা সানাদের বেশ আনন্দে কাটলো।

জাইরেনও তার বাবার সঙ্গে সে রাতটা আমোদে কাটালো।

সানাদ লোক-লস্কর নিয়ে আবার রওনা হলো।

কিন্তু বেশী দূর এগোতে পারলো না।

আকাশ জুড়ে মেঘ করলো।

সানাদ তাড়াতাড়ি সবাইকে তাঁবু খাটাতে বললো।

যে যার তাড়াতাড়ি তাঁবু খাটিয়ে ফেললো।

ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি শুরু হলো, শিলা পড়তে শুরু করলো আর সেই সঙ্গে উঠলো তুফান। তাঁবু উড়িয়ে নিয়ে যাবার যোগাড় হলো। কোন রকমে তাঁবুর মধ্যে গুটি সুটি মেরে সবাই কাঁপছে থরথর করে।

ঐ শক্তিশালী সানাদ। সেও কাঁপছে। একটুখানি আগুন হলে ভালো হতো। কিন্তু কোথায় পাবে আগুন। সবই তো ভিজে গেছে।

এমন সময় ওরা দূরে পাহাড়ের আলো দেখতে পেল। সেখানে গিয়ে দেখল একজন মস্ত শিকারী কাঠের আগুনে হাত-পা সেঁকছে। ওরা সেখান থেকে আগুন আনার চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুতেই আর আনতে পারছে না। এদিকে আগুনের অভাবে সানাদ ক্রমশ ক্ষেপে উঠছে।

শেষে জাইরেন ওর বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, এখন উপায় কী বলো? কিভাবে ঐ পাহাড়ের চূড়া থেকে আগুন আনা যায়!

জাইরেনের বাবা পরামর্শ দিলো। সেই মতো জাইরেন একটা হাঁড়ি নিয়ে উঠলো। কিছুটা অঙ্গার সে হাঁড়ির মধ্যে নিয়ে সোজা পাহাড় থেকে নেমে উঠলো। তাই থেকে সবার তাঁবুতে আগুন জ্বললো।

সানাদ আগুনে হাত-পা সেঁকে বেশ আরাম বোধ করলো।

জাইরেনের ওপর সানাদ বেশ খুশি। ছোকরার বেশ বুদ্ধি আছে বটে। আমাদের এক একটা ধাক্কা সেই-ই সামাল দিচ্ছে।

শুধু সানাদ কেন, ঐ দলের সবাই ওর ওপর খুশি। এই ঘোর বিপদের দিনে ও বাঁচিয়েছে। সোনার কাপটা এনে দিয়ে বহু লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছে। জাইরেন বুদ্ধিমানও যেমন, তেমনি ভালোও।

গভীর রাতে বৃষ্টি থামলো।

সকালটা বেশ ঝরঝরে। আকাশ পরিষ্কার। সূর্য উঠেছে। সবাই বেশ খুশি।

সানাদ এই জায়গা ছেড়ে সবাইকে রওনা হতে বললেন।

সবাই আবার ঘোড়ায় উঠলো। ছুটতে লাগলো ওদের তেজী আর সাহসী ঘোড়াগুলো। বহু পাহাড়, বন, নদী পার হয়ে ওরা এসে হাজির হলো মরু-প্রান্তরে। চারিদিকে ধূ ধূ করছে বালি আর বালি। সানাদের এখানে থামার

কোন ইচ্ছাই ছিল না।

কিন্তু উপায় কি! ঘোড়াগুলো হাঁপাচ্ছে। তারা আর কত ছুটবে! তাদেরও বিশ্রামের দরকার। তাছাড়া আরও একটা ভয় ছিল। ঘোড়াগুলোর যদি শরীর খারাপ করে, তাহলেই মুস্কিল। তার অভিযান বন্ধ হয়ে যাবে।

তাই এখানেই সানাদকে থামতে হলো।

আবার তাঁবু পড়লো। সবাই খানিক বিশ্রাম করলো। যে যার থলি থেকে সামান্য খাবার-দাবার বের করে খেলো।

কিন্তু জল কোথায়!

খাবার পর সবাই জলের সন্ধান করতে লাগলো।

মরুভূমিতে জল পাবে কোথায়!

সবাই হন্যে হয়ে খুজঁতে লাগলো।

কিন্তু কোথাও জল পেলো না।

শেষটায় সানাদ ডেকে পাঠালেন জাইরেনকে, যে করেই হোক তোমাকে জলের ব্যবস্থা করতেই হবে।

জাইরেন তো অবাক। সে কোথায় জল পাবে।

অথচ সানাদের হুকুম। অমান্য করার কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। হন্যে হয়ে জলের সন্ধান করলো। কিন্তু কোথাও জলের হদিশ পাওয়া গেল না। শেষে আবার সে এলো বাবার কাছে।

ওর বুড়ো বাপও ভাবলো অনেকক্ষণ। তারপর ছেলেকে বললো, এক কাজ কর। একটা তিন বছরের বাছুরকে মাঠের মধ্যে ছেড়ে দে। মরুভূমির বালির ওপর সে চরতে থাকুক আর ও কোথায় যায়, সেটা লক্ষ্য রাখিস। যখন দেখবি বাছুরটা এক জায়গায় থেমেছে এবং জিভ্ দিয়ে চাটছে, তখন সেই জায়গায় বালি খুড়তে আরম্ভ করবি, ওখানেই জল পাওয়া যাবে।

জাইরেন ওর বাবার কথামত বেরিয়ে পড়লো। একটা বাছুরকে বালিয়াড়িতে ছেড়ে দিল। বাছুর চরতে চরতে ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে। জাইরেনও ওকে অনুসরণ করে এগোচ্ছে। শেষে এক জায়গায় বাছুরটা এসে থামলো। জিভ দিয়ে জায়গাটা চাটতে শুরু করলো।

জাইরেন ছুটে গেলো তার কাছে।

প্রাণপণে জায়গাটা খুঁড়তে লাগলো।

আর কী আশ্চর্য! ফোয়ারার মত ঠাণ্ডা পানীয় জল বেরিয়ে আসতে লাগলো। জাইরেন স্নান করলো, খেলো, আর পাত্র ভরে জল নিয়ে এলো সানাদের জন্যে, ওর বাবার জন্যে!

দলের অন্য সবাই তখন ছুটলো সেখানে। জল খেয়ে সবাই তৃপ্তি পেলো। সানাদ ডেকে পাঠালো জাইরেনকে।

জাইরেন এসে হাজির।

সানাদ প্রশ্ন করলো, আমাদের সবগুলি সমস্যাই তুমি সমাধান করলে কী করে?

জাইরেন বললো, বুদ্ধিবলে।

এত বুদ্ধি তুমি কোথায় পেলে? প্রশ্ন করলো সানাদ।

যদি অভয় দেন তো বলতে পারি!

বেশ, অভয় দিলাম।

জাইরেন তো অবাক। একী সানাদের কণ্ঠস্বর! যার কণ্ঠস্বরে মানুষের শরীর হিম হয়ে আসে, সেই সানাদ! বিশ্বাস হয় না। একী এক ধরনের চালাকি! বাবার কথা সে বলবে? ভাবতে লাগলো যদি তার বাবার কথা জানতে পেরে ভাবে যে জাইরেন তার আদেশ অমান্য করেছে। তাহলেই হয়ে গেল! বাপ ছেলেকে একসঙ্গে হত্যা করবে! ভাবতে ভাবতে ওর শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

জাইরেন বললো, সব বুদ্ধি আমার বাবার!

তোমার বাবা বেঁচে আছে!

সানাদের চোখ দুটি আগুনের গোলার মত রাঙা হয়ে উঠলো।

জাইরেনের পা দুটো কাঁপতে লাগলো থর থর করে।

সানাদ চীৎকার করে উঠলো, জবাব দাও।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কোথায় আছে।

আমার তাঁবুতে।

তাকে কি করে এনেছো!

বস্তার মধ্যে ভরে।

নিয়ে এসো তোমার বাবাকে!

জাইরেন থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে তার বাবাকে নিয়ে এলো। বাবাকে সব কিছু জানাবার সুযোগ পেলো না।

সানাদ বস্তার মুখটা খুলতে বললো।

জাইরেন বস্তার মুখটা খুলে ফেললো।

ওর বাবা বেরিয়ে পড়লো। ভয়ে মুখটা তার ফ্যাকাশে।

সানাদ তাকালো তার অনুচরদের দিকে। ঘাতক প্রস্তুত। এই বুঝি তাকে হত্যার আদেশ পালন করতে হয়।

সানাদ বললো, পিতা, আমি আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য খুবই দুঃখিত।

তারপর সকলের উদ্দেশ্যে বললো, আজ থেকে তোমরা বৃদ্ধদের কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে চলবে।

সবাই আনন্দে হৈ হৈ করে উঠলো। ঘাতক তরোয়াল ফেলে দিলো। চারদিক থেকে ধ্বনি উঠলো, জয়, সানাদ খানের জয়।

অনেক দিন আগের কথা।

এক গ্রামে এক বুড়ী থাকতো। তার ছিল এক মেয়ে। মেয়েটিকে দেখতেও যেমন সুশ্রী তেমনি স্বভাবটি। মায়ের কাছে কাছেই থাকতো। বুড়ীর স্বামী ছিল না। রোজগার-পাতি তেমন কিছু ছিল না। কাজে কাজেই ওদের অবস্থা ছিল খুব খারাপ।

একদিন বুড়ী সামান্য কিছু ধান সেদ্ধ করে শুকোতে দিলো সামনের এক-ফালি উঠোনে। মেয়েটিকে ডেকে বললো, মা, উঠোনের ধানগুলি দেখিস। পাখীতে খেয়ে যায় না।

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

চড়া রোদ্দুরে ধান শুকোতে লাগলো। মাঝে মাঝে দু-একটা ছোট ছোট

পাখী আসে। ফড়িং এর মতো লাফ দিয়ে ধান ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে
মেয়েটি অমনি হৈ হৈ করে তাড়া করে। আর পাখীও যায় পালিয়ে।

তখন ঠিক ভর দুপুর। একটা পাখী এসে বসলো উঠোন থেকে বেশ খানিক
দূরে। দেখতে প্রায় কাকের মতো। কিন্তু গায়ের রঙটি তার কালো নয়। চো
দুটিতে কেমন যেন মায়া মাখানো দৃষ্টি। পিঠের ওপর সোনার পালখের ডান
বেশ রোখালো পাখী। কোনো ভয় ডর নেই। লাফিয়ে লাফিয়ে সে এগি
আসতে লাগলো। মেয়েটি হৈ হৈ করে তাড়া করলো। পাখীটি সরে গে
না, উড়েও গেলো না। বরং লাফিয়ে এসে পড়লো ধানের ওপর। টুক্ টু
করে ধান খেলো—সব শেষ করে ফেললো! মেয়েটি ভ্যা করে কেঁদে ফেললো

আমরা ভারী গরীব। আমাদের এক কণাও খাবার নেই। আমার মা
খাবে। আমি কি খাবো?

এই কথাগুলি বলতে লাগলো আর কাঁদতে লাগলো।

সোনালী ডানাওয়ালা পাখীটি লাফিয়ে এলো তার কাছে। মিষ্টি স্ব
বললো, খুকুমণি, তুমি কাঁদছো কেন? আমি খেয়ে ফেলেছি তো কি হয়েছে
আমি তোমার ধানের দাম চুকিয়ে দেবো। সূর্য্যি মামা যখন অস্তাচলে যা
ঠিক তখন গ্রামের বাইরে যে তেঁতুল গাছটা আছে, তারই তলায় এসো। অ
তোমাকে কিছু দেবো! ছিঃ, কাঁদতে নেই।

এই কথা বলে পাখীটি উড়ে গেলো ফুর্‌ৎ করে।

এদিকে দিনমণি তার কাজ শেষ করে বিকেল হতেই পশ্চিম গগনে ঢ
পড়লেন। সেদিকটা সোনার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মেয়েটি
পেরিয়ে এসে হাজির হলো সেই তেঁতুল গাছের তলায়। উপরে তাকি
দেখলো। সেই বিশাল গাছের ওপরে একটি সোনার ঘর। ছোট্ট সেই
খানির ছোট্ট জানলার মুখ বাড়িয়ে পাখীটি দেখতে পেলো মেয়েটিকে। বলে
ওহ্, তাহলে তুমি এসেছো? এসো। ওপরে উঠে এসো। রোসো, রো
তোমাকে মইটা আগে নামিয়ে দিই, তবে তো উঠবে! কোন্ মই নে
সোনার, রূপোর না, পিতলের? কোন্‌টা?

মেয়েটি উত্তর দিলো, আমি গরীব। সোনার মই আমার কী হবে?
বরং একটা পিতলের মই দাও।

পাখী তার জন্য একখানি সোনার মই নামিয়ে দিলো। মেয়েটি সেই

য়· তর্ তর্ করে ওপরে উঠে গেলো। সোনার ঘরে গিয়ে বসলো সে।
। তাকে বললো, খুকু, আজ তোমাকে আমার এখানে খেয়ে যেতে হবে।
না কিসের থালায় খাবে, সোনার, রূপোর, নাকি পিতলের ?

মেয়েটি আগের মতই জবাব দিলো, আমি গরীব। সোনার থালায়
মার কোন প্রয়োজন নেই। পিতলের থালাই আমার যথেষ্ট।

এবারও মেয়েটির জন্য সোনার থালা এলো। তার ওপর সাজানো হলো
না ধরণের সুগন্ধ খাবার।

মেয়েটি পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাবার খেলো। পাখীটি বললো, তুমি খুব ভালো
য়ে। চিরকাল তোমার সঙ্গে আমার থাকতে ইচ্ছা করে। কিন্তু আমি
গমাকে যতখানি চাই, তোমার মা তোমাকে তার চেয়েও বেশী চায়। তাই
ন্ধকার নামার আগেই তোমাকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেব।

এই কথা বলে সে তার শোবার ঘরে ঢুকে তিনটি বাক্স নিয়ে এলো। একটি
শ বড়ো, দ্বিতীয়টি মাঝারি মাপের। তৃতীয়টি ছোট। তিনটি বাক্স দেখিয়ে
খী মেয়েটিকে বললো, তুমি কোনটি নেবে ?

মেয়েটি বললো, তুমি যেটুকু ধান খেয়েছো তার দাম তো খুব বেশী হবে
। ছোট বাক্সটির দামও তার চেয়ে বেশী হবে। আমি ছোট বাক্সটি নেবো।

বেশ, এইটি তোমার মাকে দিও। এই বলে ছোট বাক্সটি সে মেয়েটির
তে তুলে দিলো।

মেয়েটি সোনার মই বেয়ে নেমে এলো। পাখীকে হাত নেড়ে বিদায়
গ্রামের পথ পার হয়ে সে বাড়ি এসে পৌছালো। মায়ের হাতে তুলে
লো বাক্সটা। মা মেয়ে বাক্স খুলেই অবাক। বাক্সের মধ্যে একশো অমূল্য
রাগমণি। সেগুলি পেয়ে বুড়ী বেশ ধনী হয়ে উঠলো এবং বিলাসে দিন
টাতে লাগলো।

সে গ্রামে আর একজন বিধবা বুড়ী থাকতো। তারও একটি মেয়ে ছিল।
। মেয়েটি যেমন লোভী তেমনি বদমেজাজী। ওরা সেই সোনালী ডানাওয়ালা
াখীর কথা, সেই বাক্সের কথা শুনেছিল। হিংসায় ওদের বুক জ্বলছিল।

একদিন সেই বুড়ীও কিছু ধান শুকোতে দিলো উঠানে। আর সেই লোভী

মেয়েটা ওৎ পেতে বসে রইলো। কিন্তু সে ছিলো ভারী অলস। ফলে পাখীদের তেমন করে তাড়া করতে পারলো না। পাখীরা বেশ কিছু ধান খেয়ে গেলো শেষটায় যখন সেই সোনালী ডানাওয়ালা পাখীটি এলো তখন সামান্য ধান অবশিষ্ট ছিল। যাই হোক, যেটুকুই ধান ছিলো সেটুকুই সে খেলো।

বদমেজাজী মেয়েটা তাকে বললো, এই পাখী, তুই যা খেয়েছিস তার জন্যে আমাকে আর আমার মাকে সোনাদানা দে।

পাখী মেয়েটির দিকে কট্ মট্ করে তাকালো বটে, তবে মিষ্টি করে বললো, ছোট খুকু, তোমাকে ফসলের দাম দেবো বৈকি! সুয্যি ডোবার আগে গাঁয়ের বাইরে যে তেঁতুল গাছটা আছে তারই তলায় এসো, তোমাকে কিছু দেবো।

সূর্য ডোবার আগে সেই মেয়েটি গাঁয়ের বাইরে বিশাল তেঁতুল গাছের তলায় এসে হাজির হলো। পাখীটি বেরিয়ে আসার আগেই মেয়েটি চীৎকার করতে লাগলো, এই পাখী, বাইরে বেরিয়ে এসো, তোমার কথা রাখো।

পাখী জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে বললো, কোন্ মইতে উঠবে, সোনার রূপোর, নাকি পিতলের।

মেয়েটি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলো, সোনার মই।

কিন্তু হায়। সোনার বদলে রূপোর মই বাড়িয়ে দিলো পাখীটি।

মেয়েটি মই বেয়ে তরতরিয়ে পাখীর সোনার ঘরে ঢুকলো।

পাখী বললো, আজ কিন্তু তোমাকে আমার সঙ্গে খেতে হবে? এখন বলো কোন্ থালায় খাবে? সোনার, রূপোর আর পিতলের মধ্যে কোনটি চাই?

সোনার থালা। মেয়েটি চটপট জবাব দিলো।

এলো পিতলের থালা। তাতে থরে থরে সাজানো অতি সাধারণ খাবার।

লোভী মেয়েটি এই সব খাবার দেখে ভারী বিরক্ত হলো। তবু সে খেলো

পাখীটি তার শোবার ঘর থেকে আগের মতো তিনটি বাক্স নিয়ে এসে বললো, তোমার কোনটি চাই?

মেয়েটি ঐ তিনটি বাক্সের মধ্যে বড়োটি দেখিয়ে বললো, এইটি আমার চাই।

বেশ, এই নিয়ে যাও। তোমার মাকে দিও।

আবাধ্য মেয়েটি বড়ো বাক্সটি মাথায় নিয়ে কোন রকমে মই বেয়ে নীচে

নেমে এলো। পাখীটিকে ধন্যবাদ জানালো না।

গ্রামের পথ বেয়ে সে বাড়ি এসে পৌঁছলো।

তার মাও ভারী খুশি। সন্ধ্যেবেলায় মা আর মেয়ে প্রদীপের আলোর সামনে বাক্সটি খুলেই লাফ দিয়ে উঠলো।

ও মা, এ যে সাপ!

সত্যিই একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়েছিল বাক্সটার মধ্যে। বাক্স খোলা পেয়েই সে ফণা তুলে ফোঁস করে উঠলো। তারপর বাক্স থেকে বেরিয়ে, ওদের ঘরের সীমানা পার হয়ে ফোঁস ফোঁস করতে করতে বেরিয়ে চলে গেল।

মেয়েটি আর তার মা ভয়ার্ত হয়ে চুপটি করে বসে রইলো।

বাইরে তখন নেমে এসেছে নিবিড় অন্ধকার।

সে অনেককাল আগেকার কথা।

পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশের এক ঝিলের ধারে জেলেদের বস্তি। ঝিলটির নাম কিনঝর। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সে এক মস্ত বড়ো ঝিল। কাঁচের মতো জল টলটল করতো। আর তাতে খেলে বেড়াতো অসংখ্য মাছ। জেলেরা সেই মাছ ধরে জীবিকা উপার্জন করতো। দূর দূরান্ত থেকে ঠিকাদারেরা সেই মাছ কিনে নিয়ে যেতো। কিন্তু তাহলে কি হবে! জেলেদের অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। বড় গরীব ওরা।

ঝিলের গা ঘেঁষে সারি সারি ঝুপড়ির মত ঘর। জেলেদের বাস। সারা অঞ্চলটায় মাছের আঁশ্‌টে গন্ধ। বাইরের লোকজন বড় একটা আসে না! এলেও মাছের উগ্র গন্ধে বেশিক্ষণ টিকতেও পারে না। জেলেদের কাচাবাচ্ছা

াবই স্বল্পবাস পড়ে ঘুরে বেড়ায় ঝিলের ধারে। মাছ ধরে, খেলা করে, ছোট ছোট নৌকো নিয়ে ঝিলের এ মাথা থেকে সে মাথা পর্যন্ত পাড়ি দিয়ে বেড়ায়। ওদের গানে-কথায় ঝিলের মাথার ওপরের বাতাস ভরে ওঠে।

জেলেদের বস্তিতে সম্পদ নেই, সুখ আছে। তাই ওদের উৎসব আছে, গান, গল্পে মন আছে, মেজাজ আছে। ঝিলের ধারে উৎসবের দিনে নাচ হয়। গান ওঠে। রাতের ঝিল যেন মৃদু বাতাসের সঙ্গে ছোট ছোট ঢেউ তুলে নাচে। আকাশের ছোট ছোট সাদা মেঘের টুকরো খেলা করে। আর নুরি?

হ্যাঁ। জেলেদের বস্তিতে একই মাত্র সেই পদ্ম। পাঁকের পদ্ম। তার রূপ আছে। সুঠাম স্বাস্থ্য আছে। প্রাণ ভরা আনন্দ আছে। আর আছে কণ্ঠ ভরা গান। আকাশের নীল ঘন হয়ে ওর চোখের তারায় এসে বসেছে। ঘন চুলের কালো ঢেউ কপাল থেকে শুরু করে মাথা বেয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে পিঠের ওপর। পাতলা দুটি ঠোঁটে গোলাপের রঙ। আর সারা গায়ে ধরে রেখেছে সকালের মিঠে রোদের ঝলক।

বাবা মা শখ করে ওর নাম রেখেছে নুরি। আলোর মতই সে উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়ী। ঝিলের ধারে মস্ত এক পাথরের টিলার ওপর বসে বসে আকাশ দেখছিলো আর গুন গুন স্বরে গান গাইছিলো।

ওর ছায়া পড়েছিল ঝিলের জলে। ছোট ছোট ঢেউগুলো ওর ছায়াকে ভাঙছিল আর গড়ছিল। ওর ছায়ার সঙ্গে মজার খেলা খেলছিল। আর বাতাস বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ওর মিষ্টি গান—দূর থেকে দূরান্তে—ঝিলের এক প্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে—আকাশের এক কিনার থেকে আর এক কিনারে।

আর সেই গান সেই দিন কানে গিয়ে পৌঁছলো জাম তামাচির। সিন্ধু প্রদেশের এক শাসক। সুন্দর কান্তি। বিশাল বপুর ওপরে হীরে জহরতের পোশাক ঝলমল করছিল। বন্ধুর সঙ্গে ঝিলের জলে নৌকা নিয়ে বেরিয়েছিলেন হাওয়া খেতে। দিবাকর তখন সারাদিনের কাজ চুকিয়ে পশ্চিমে ক্লান্ত দেহে ঢলে পড়েছে। তার গাঢ় লাল রঙের ঢেউ এসে পড়েছে ঝিলের জলে। যেন হোলির ফাগ ঢেলে দিয়েছে জলে। সে রঙ এসে পড়েছে নুরির চোখে মুখে।

জাম তামাচির নৌকাখানা ঝিলের গা ঘেঁষেই এগোচ্ছিল। হঠাৎ তার চোখ

পড়লো হুরির দিকে। চোখ স্থির হয়ে গেল। মনে হলো বেহেস্তের কোন পরী এসে যেন ঐ টিলায় বসেছে। জামতামাচি অবাক হয়ে দেখতে লাগলো।

বন্ধুটি বললো, কী দেখছো অমন করে?

বেহেস্তের আলোর রোশনাই—জবাব দিলো তামাচি।

বন্ধুটি বললে, শাদী করবে নাকি?

জাম তামাচি তৎক্ষণাৎ বললো, তুমি ব্যবস্থা কর।

বন্ধুটি বললো, বেশ. আমি ব্যবস্থা করবো।

জলে ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ তুলে নৌকাটা সেদিনের মতো চলে গেল। আঁধার নামলো ঝিলের বুকে। হুরি ফিরে গেল বাড়িতে।

পরের দিন সকালে সেই বন্ধু এসে হাজির হলো জেলেদের বস্তিতে। অনেক খোঁজ খবর করে হুরির সন্ধান পেলো। ওদের ঘরে গিয়ে বসলো আর শাসক জাম তামাচির মনের কথা বললো। হুরির বাবা ছিল সৎ আর নির্লোভ জেলে। তামাচির অভিলাষ শুনে আনন্দিত হলেও বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, আমরা গরীব জেলে। আমাদের মেয়ে কি প্রাসাদে থাকবার যোগ্য। আল্লার অনেক মেহেরবানি, তাই আমার অভাগিনী হুরিকে বাদশার চোখে ধরেছে। উনি ওকে আদর করে নিয়ে যাবেন। এর চেয়ে আমার আর কি সৌভাগ্য হতে পারে?

বন্ধুটি বললো, শাদীর দিনক্ষণ আপনাদের বলে যাবো।

এই বলে সে বিদায় নিলো।

এদিকে এই খবর চাউর হয়ে গেলো জেলে বস্তিতে। সবাই খুশী। জেলে বস্তির মেয়ে প্রাসাদে যাবে। বেগম সাহেবা হবে, হীরে জহরৎ পরবে। দামী দামী পোশাক পড়বে, ভালো খানা খাবে—এ সব কথা জেলে বস্তির কোন মানুষই ভাবতে পাবে না।

হুরির রূপ আছে, রূপের জৌলুস আছে। কিন্তু তাই বলে একেবারে খোদ বেগম সাহেবার মর্যাদা! এ যে স্বপ্নের ও অতীত। যদি আসমান থেকে তারা খসে পড়ে, চাঁদ নেমে আসে জেলে বস্তিতে—তাতেও বোধহয় তারা এতটা অবাক হবে না।

হুরির বাবার একদিকে আনন্দ আর একদিকে চিন্তা। নবাবের প্রাসাদে দুনিয়ার তামাম সুন্দরীরা থাকে। তাদের উঁচু ঘরানা। রাজপরিবার থেকে তারা এসেছে। তারা কি তাদের আদরের ধন, চোখের মণি হুরিকে মর্যাদা দেবে? হয়ত কত কটু কথা বলবে, অত্যাচার অপমান করবে, জেলের ঘরের মেয়ে বলে তাকে অবজ্ঞা করবে। হয়ত তার সৌভাগ্যে ঈর্ষাকাতর হয়ে ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।

গরীব জেলে-বাপের মেয়ে। মেয়ের চিন্তায় বুক ফাটবে, তবু প্রাসাদে গিয়ে মেয়ের খোঁজ খবর করার সাহস হবে না।

হুরির মাও কাঁদে।

পড়শীরা মায়ের বুকের ব্যথা বোঝে না। তারা ভাবে হুরির মায়ের চোখে আনন্দাশ্রু।

পড়শীরা হুরির বিয়ের সম্ভাবনার কথায় আনন্দ করে, হৈ হুল্লোড় করে। হুরির সখীরা ওকে নিয়ে গান বাঁধে, ঝিলের ধারে ঝিরঝিরে হাওয়ায় বেড়াতে বেড়াতে কত রকমের ঠাট্টা তামাসা করে। হাওয়ার সঙ্গে ওরাও দোল খায়, নাচে আর ছুটোছুটি করতে করতে গায়ে গায়ে ঢলে পড়ে।

এদিকে জাম তামাচির পক্ষ থেকে বার্তা বয়ে নিয়ে আসে দূত। তার সঙ্গে দুজন অশ্বারোহী। দীর্ঘ চেহারা। হাতে বল্লম।

হুরির বাবা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এলো। দূত তাকে সেলাম ঠুকে জাম তামাচির বার্তা ঘোষণা করলো:

"আগামী পরশু আপনার কন্যাকে শাদী করবার জন্যে জনাব জামতামাচি সমারোহ করে এখানে আসবেন। সন্ধ্যা সাত ঘটিকায়। শাদীর সমস্ত আয়োজন জনাবের ইচ্ছা অনুসারে সরকারী লোকেরাই করে যাবে। জনাবের নির্দেশে ভাবী বেগমের সমস্ত গয়নাগাটি আগাম চলে আসবে।"

ঘোষণা শুনে হুরির বাপ আশ্বস্ত হলো। পড়শীরা হৈ-হুল্লোড় করলো। এক-কথায় বলতে লাগলো, মেয়েটার ভাগ্য বটে!

পরের দিন ভোরের আলো ফুটতেই অশ্বারোহীর দল এসে উপস্থিত হলো। এলো হাতী, লোকলস্কর। ঝিলের ধার আলোর রোশনাইএ ভরে উঠলো।

গান বাজনার আসর বসলো।

মেয়েরাও এলো। হুরিকে তারা আতর-দেওয়া জলে চান করালো। খুসবু মাখালো তার সারা গায়ে। সোনাগলানো গায়ে পরালো হালকা নীলরঙের পোশাক। তাতে নানারঙের আঁকিবুঁকি। মাথার চুলে মাখালো খুসবু তেল। ঢেউ খেলানো চুলে সাপের মত বেণী করে দু কাঁধের দু-পাশে ঝুলিয়ে দিল। তাতে দিলো জড়ির ফিতে আর সুগন্ধি প্রসাধন। সূর্যের প্রভাতী আলোর জ্যোতি ফুটলো তাতে। কিন্তু চাঁদেরও স্নিগ্ধতা রইলো তাতে। গলায় পরিয়ে দিলো হীরে মোতি পান্না খচিত নানা অলংকার।

আরশিতে মুখ দেখলো হুরি। এ কে? নিজেই প্রশ্ন করলো হুরি! নিজেকে চিনতে পারছে না সে। এমন করে সেজে তার কোন অহংকার নেই। নিজের রূপের লাবণ্যে সে নিজেই লজ্জায় গোলাপের মত লাল হয়ে উঠলো। চোখের পাতাগুলি কেঁপে উঠলো থরথরিয়ে। কপালে জমলো ঘাম।

বান্ধবী হুরিকে ঠাট্টা করলো।

হুরি সে ঠাট্টার কোন জবাব দিতে পারলো না।

পরের দিন জেলেবস্তির মানুষের আনন্দের সীমা নেই। সিন্ধু দেশের শাসক স্বয়ং জাম তামাচি জমকালো পোশাক পরে সাদা ঘোড়ায় চড়ে আসছে। সঙ্গে আসছে ইয়ারদোস্ত, অমাত্য, সেনা; লোকলস্কর। আর বাজনা-বাদ্যি, আলোর রোশনাই।

হুরি লজ্জাবতী লতার মতো অপেক্ষা করছে।

জাম তামাচি তার কাছে খোদার বহুৎ মেহেরবানির মতো!

জামতামাচি এলো। হুরিকে শাদী করে, ইয়ার দোস্তের সঙ্গে ঠাট্টা-মস্করা করে পরের দিন সকালে জেলে বস্তির আলো হুরিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেল প্রাসাদে।

জাম তামাচির সাধ মিটলো। হুরিকে পেয়ে সেও খুব খুশি। কিন্‌ঝর ঝিলের ধারে যেসব মাছ-মারার দল বাস করতো তাদের ওপর তামাচির দয়া হলো। ওদের রাজকর মকুব করে দিলো। আর যাতে ওরা মাছ ধরে বেশী দামে বিক্রি করে দুটো পয়সার মুখ দেখতে পায় সেজন্য বাজার তৈরী করে দিলো। দয়

বেঁধে দিলো। জাম তামাচির হুকুমে বস্তির মানুষের ঘরদোর নতুন করে গড়ে দেওয়া হলো।

কিন্‌ঝির ঝিলের বস্তিতে লোকের জীবনে এলো সৌভাগ্যের জোয়ার।

এদিকে জাম তামাচি প্রাসাদে ফিরলে তাকে নিয়ে কেটে যায় সারাক্ষণ। নুরির রূপ আছে কিন্তু দেমাক নেই। জাম তামাচি নুরির প্রশংসা করে। তাকে সবচেয়ে প্রিয় রাণী বলে কাছে ঠাঁই দেয়। কিন্তু নুরি এই সম্মানে গর্বিত হয় না। ভারী লজ্জা পায় সে। জাম তামাচির মুখে হাত রেখে নিষেধ করে, প্রভু, আল্লার বড়ো মেহেরবানি, তাই বাঁদীকে পায়ে ঠাঁই দিয়েছেন। আমায় অতিরিক্ত কিছু দেবেন না।

তামাচির কাছে নুরির একথা ভালো ঠেকে না। তার মনে হয় নুরি বোধহয় তার রূপের গর্বে এই অতি বিনয়ী ভাব দেখায়। আসলে ওর দেমাক আছে।

তামাচি মানে, রূপের দেমাক তো থাকতেই পারে! তাতে অন্যায় তো কিছু নেই। বরং দেমাক থাকলেই রূপ খোলে বেশি। রূপের কদর করতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু নুরির একী বিচিত্র স্বভাব। ওকে ভালবাসলে পছন্দ হয় না। ওর রূপের প্রশংসা করলে লজ্জা পায়। লতার মত নুইয়ে পড়ে সে।

জাম তামাচির অন্যান্য বেগমেরা ওর ওপর অসন্তুষ্ট। ওরা ও ওকে ভালো চোখে দেখে না। কারণ ওরই জন্যে জাম তামাচি আজ ওদের কাছ থেকে অনেক দূর সরে গেছে। ওদের রূপের প্রশংসা সে আর করে না।

কিন্তু কী আর করে? স্বয়ং জাম তাকে যখন ভালবাসে, তোয়াজ করে। তখন এদের ঈর্ষা করেই বা কী লাভ! দেখাই যাক না, কতদিন এই মোহ থাকে তামাচির।

ওরা অপেক্ষা করতে থাকে।

একদিন জাম তামাচি সব বেগমদের কাছে ডেকে বললেন, তোমরা সবাই সে যার মনের মত পোশাক পরে সবচেয়ে সুন্দরী হয়ে আমার কাছে আসবে। যে আমার মন জয় করতে পারবে তাকে আমি আমার খাস বেগম করবো।।

জাম তামাচির এই কথা শুনে বেগমরা সবাই খুশি হলো বটে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো। কিভাবে নিজেকে সবচেয়ে বেশী সুন্দরী করে তোলা যায়? সবাই নতুন করে রূপচর্চায় মেতে উঠলো। মনে ধরলো রঙ। চোখে মদির চাহনি। আতর জলে স্নান। খুসবু প্রসাধন ব্যবহার। আর খুশির আবেগে সারা মুখে ফুটে উঠলো গোলাপের আভা।

একদিন জাম তামাচির নির্দেশমত সবাই নতুন নতুন পোশাক পরলো। কেউ গাঢ় নীল রঙের ওপর সাদা ফুলের বুটি দেওয়া দামী রেশমী পোশাক পরলো। কেউ বা পরলো গাঢ় হলুদরঙের ওপর কালো গোলাপের ছাপা পোশাক। আর কেউ পড়লো আগুনের মত গনগনে লাল পোশাক। রঙের বাহারী জৌলুস।

জাম তামাচি সিংহাসনে এসে বসলো। তাদের পোশাকের উজ্জ্বল ছটায় তামাচির চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিলো। তামাচি বললো, সবাইকে দেখছি, নুরি কোথায়?

সবাই বললো, আছে কোথাও। আমাদের রূপের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি বলে সভায় আসেনি।

বাদশা, আমি এখানেই আছি। ভীরুকণ্ঠে জবাব দিলো নুরি।

জাম তামাচি ওর দিকে তাকালো। সিংহাসন থেকে খানিক দূরে সে সলজ্জভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে আসমানী বুটিদার পর্দা বাতাসে কাঁপছিল। পরণে ছিল দুধের মত সাদা মখমলের পোশাক। তাতে কোন কারু কাজ নেই। গায়ে নেই কোন গহনা। মাথার রেশমী কালো চুলের বেশ খানিকটা ঢল নেমেছে ডান কাঁধ বেয়ে বুকের ওপর। মুখের রঙ লজ্জায় আর শংকায় কাঁঠালী চাঁপার মত মিষ্টি হলুদের আভায় জ্যোতির্ময় হয়েছে। চোখের পাতায় কাঁপন।

জাম তামাচি সিংহাসন থেকে নেমে পড়লো। তার মনে হলো। যেন রাতের নীল আকাশে অভিমানী চাঁদ ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে।

তামাচি এগিয়ে এসে নুরির হাত ধরে কাছে নিয়ে এলো। নিজের কাছে বসিয়ে ঘোষণা করলো, নুরি, আমার চাঁদ। ওর রূপে তেষ্টা মেটে। ও আমার খাসবেগম হলো আজ থেকে। তোমরা ওর যত্ন করবে।

নুরি নতজানু হয়ে জাম তামাচিকে সেলাম ঠুকে বললো, আমি আপনার

বাঁদী। খোদা করুন, আমি যুগ যুগ ধরে আপনার পায়ে যেন ঠাঁই পাই।

তামাচি অবাক হয়ে তাকালো ওর চোখে, বললো, নুরি, এইখানেই তোমার জিত। খোদা তোমাকে আশীর্বাদ করুন। নম্রতাই তোমার রূপ—সেইটাই তোমার আসল পরিচয়।

তামাচি ওর আচরণে খুশী হয়ে সেদিন উৎসবের নির্দেশ দিলো।

সারা সিন্ধুপ্রদেশ জুড়ে সেদিন আলোর উৎসব হলো।

মান্ধাতা আমলের কথা।

বিহারের একগ্রামে বাস করতো সাত ভাই। ভারী মিলমিশ ওদের। সব সময়ই হাসি খুশিতে দিন কাটে ওদের। ছয় ভায়ের বিয়ে হয়ে গেল। ছোট ভাই লিতা। সে-ই রইলো বাকী। সে বিয়ে করে নি। বিয়ে করতে তার মন চায় না। এ নিয়ে বৌদিরা তাকে বেশ ঠাট্টা করে। নানারকম সন্দেহ করে।

কিন্তু লিতা এসব হেসে উড়িয়ে দেয়। ঠাট্টা তামাসার কোন গুরুত্ব দেয় নি। একদিন বড়ো বৌদি লিতাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললো, আচ্ছা লিতা, তোমার ব্যাপারখানা কি বলতো? মেঘে মেঘে বেলা তো হলো। এবার বিয়েয় বসো। নইলে সাদা চুলে কে আর তোমায় বিয়ে করবে?

লিতা হো-হো করে হেসে ওঠে। তারপর চোখ বড়ো করে বৌদিকে বলে, যদি কোনদিন বেলবতী রাজকন্যার খোঁজ পাই, তবে তাকেই বিয়ে করবো। অন্য কোন মেয়েকে আমি বিয়েই করবো না।

বৌদি হেসে ওঠে। বলে, কোথায় তোমার সে বেলবতী রাজকন্যে? তার খবর জানো?

লিতা কোন জবাব দিতে পারে না। সে বেলবতী রাজকন্যার খবর সত্যিই জানে না।

অন্যান্য বৌদিরাও লিতার এই আজগুবি পণের কথা শুনে হাসাহাসি করে।

লিতার মনটাও খারাপ হয়। সত্যিই কি বেলবতী রাজকন্যে নেই? যদি সে থাকে, তবে সে কোথায়? যে করেই হোক তাকে খুঁজে বের করতে হবে। কঠিন প্রতিজ্ঞা করলো সে।

একদিন সে বেলবতী রাজকন্যার খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। হাঁটছে তো হাঁটছেই। শহর পার হয়ে একটা গভীর জংগলে ঢুকে পড়লো। সেই ঠাঁয়ে থাকতো এক মুনি। ইয়া তাঁর জটা। সারামুখে ধপ্‌ধপে্ সাদা দাড়ি। লিতা মুনিকে প্রণাম করে রাজকন্যের খোঁজ চাইলো তাঁর কাছে। মুনি তাকে সাফ জবাব দিলেন তিনি বেলবতী রাজকন্যার খবর জানেন না। তবে এখান থেকে আর একদিনের পথ হেঁটে গেলে আর একজন মুনির দেখা পাওয়া যাবে। তাঁরই মতন চেহারা। তিনি বলতে পারেন বেলবতীর সন্ধান।

লিতা বিদায় নিলো তাঁর কাছ থেকে। জংগলের পথ সংকীর্ণ হয়ে আসে। অন্ধকার নামে। রাতটুকু জংগলের ভেতর গাছের ওপর কাটিয়ে লিতা আবার চলতে শুরু করে। পথ শেষ করে সে এসে হাজির হলো আগের মতো একটি আশ্রমে। সেখানে এক মুনি বাস করে। সেই রকম জটজুট। আর লম্বা সাদা দাড়ি। লিতা তাঁকে প্রণাম করে বললেন, প্রভু। আমি বেলবতী

রাজকন্যার খোঁজে বেরিয়েছি। আপনি আমায় উপায় বলে দিন।

মুনি এবারও সাফ জবাব দিলেন, বাছা, আমি বেলবতীর খবর জানি না। এখান থেকে তিনদিনের পথ হেঁটে গেলে আর একজন মুনির আশ্রম পাবে সেখানে গেলে তিনি তোমাকে বেলবতী রাজকন্যার সন্ধান দিতে পারবেন।

আবার পথ হাঁটতে শুরু করলো লিতা। তিনদিন পর সে এক মুনির আশ্রমে এসে হাজির হলো। মুনিকে সে জানালো তার মনের কথা। মুনি শান্ত কণ্ঠে তাকে বসতে বসলেন। তারপর জানালেন যে, তিনি লিতাকে বেলবতীর খবর জানাবে এবং যাতে সে রাজকন্যাকে পায় সে ব্যাপারে সাহায্যও করবে। লিতা মুনির প্রস্তাবে খুব খুশি হলো।

মুনি তাকে বললেন, আমি যা বলবো, তাই করতে হবে। তবেই বেলবতী রাজকন্যাকে পাবে। মনে রেখো কাজটা মোটেই সহজ নয়। এখান থেকে খানিক দূরে একটা গাছ আছে। তাতে দেখবে অনেক বেল ঝুলছে। তার মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড়ো তারই মধ্যে বেলবতী থাকে। সেই বেলটি তোমায় পেড়ে আনতে হবে। তবে খুব সাবধান। বেল গাছের চারপাশে রাক্ষসেরা পাহারা দিচ্ছে। তারা তোমাকে দেখতে পেলেই খেয়ে ফেলবে। যদি ঠিক বেলটা আনতে না পারো তাহলে আর তোমার রক্ষে নেই।

লিতা মুনির কথা বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনলো। মুনি তাকে বেলগাছেরও সন্ধান বলে দিলো। তিনি তাকে একটা ছোট পাখীতে পরিণত করলেন।

পাখী হয়ে লিতা ফড়্ ফড়্ করে উড়ে গেলো সেই বেলগাছে। রাশি রাশি বেল ঝুলছে। সেই গাছের চারপাশে রাক্ষসেরা পাহারা দিচ্ছে। কী ভীষণ চেহারা তাদের! লিতা ভয়ে পেয়ে গেলো তাদের দেখে। কাঁপতে কাঁপতে সে বেলগাছের কাছে গিয়ে প্রথম যে বেলটা পেল সেটা নিয়েই পালাতে গেলো। কিন্তু সে বেলটা বড়ো নয়।

আর যাবে কোথায়! ভুল হয়ে গেছে তার! বেল নিয়ে পালাবে কোথায়? তখনি রাক্ষসেরা তাকে খপ করে ধরেই মুখে পুড়ে দিলো। লিতার জান শেষ।

এদিকে লিতার জন্যে মুনি অনেক অপেক্ষা করেও তাকে ফিরতে না দেখে খুব ভয় পেয়ে গেলেন। খবরটা জানার জন্যে তিনি একটা কাককে পাঠালেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কাক ফিরে এসে জানালো, রাক্ষসেরা লিতাকে খেয়ে ফেলেছে।

মুনি তখন কাককে বললেন, রাক্ষসেরা যে বিষ্ঠা ত্যাগ করেছে তা কুড়িয়ে আন।

কাক আবার উড়ে গেলো। খানিক পরে ঠোঁটে করে বয়ে নিয়ে এলো রাক্ষসের বিষ্ঠা।

মুনি সেই বিষ্ঠা থেকে লিতাকে আবার বাঁচিয়ে তুললেন। খুব বকলেন তাকে। আর সাবধান করে বলে দিলেন, এমন ভুল আর যেন সে না করে।

লিতা মুনিকে বললো, প্রভু আবার আমি যাবো। আপনি আমায় সাহায্য করুন।

মুনি এবার তাকে টিয়া পাখী বানিয়ে দিলেন। লিতা এবার একেবারে বড়ো বেলটাকে নিয়ে পালাতে চেষ্টা করলো। রাক্ষসেরা হৈ হৈ করে তাড়া করলো তাকে। মুনি তখনি লিতাকে আবার মাছি করে ফেললো। ব্যস, রাক্ষসেরা আর তাকে দেখতে পেলো না। তারা ফিরে গেলো।

লিতা মুনির দয়ায় আবার নিজের চেহারা ফিরে পেলো। বেলটা নিয়ে সে মুনির কাছে হাজির হলো। মুনি তাকে জানিয়ে দিলেন ঐ বেলের ভেতর বাস করছে বেলবতী রাজকন্যা। সে যেন কুয়োর কাছে গিয়ে বেলটাকে আস্তে আস্তে ভাঙে।

লিতা কুয়োর ধারে এসে বসলো। বেলটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। এই বেলের মধ্যেই আছে বেলবতী কন্যা। তাকে দেখবার জন্যে সে ছটফট করলো। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব তেজময়ী জ্যোতির মতো বেলবতী রাজকন্যাও বেরিয়ে এলো। কিন্তু হায়! সেই আলোর জ্যোতি সইতে পারলো না লিতা। মুহূর্তে প্রাণ ত্যাগ করলো সে।

রাজকন্যা লিতার শোকে হায় হায় করে উঠলো।

সে পথে বাড়ি ফিরছিলো এক কামার-কন্যা। রাজকন্যাকে কাঁদতে দেখে সে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, তোমার কি হয়েছে ভাই, অমন করে কাঁদছো কেন?

রাজকন্যা চোখ মুছতে মুছতে বললো, আমার সাথীটি মারা গেছে বোন। তাই কাঁদছি।

কামার-কন্যা তাকে সমবেদনা জানিয়ে চলে যাচ্ছিল। রাজকন্যা তাবে বললো বোন, আমার একটা উপকার করবে ?

কি করতে হবে বলো। জানতে চাইলো কামার-কন্যা।

রাজকন্যা বললো, এই কুয়ো থেকে খানিকটা জল তুলে দাও আমি সেই জল খাইয়ে আমার সাথীটিকে বাঁচিয়ে তুলবো।

কামার-কন্যা কি যেন ভাবলো। তারপর বললো, না বোনটি, কুয়ো থেকে আমি জল তুলতে পারবো না।

অগত্যা রাজকন্যা কুয়ো থেকে জল তুলতে গেলো। কামার-কন্যা অমনি তাকে পেছন থেকে জোরে এক ধাক্কা মারলো। রাজকন্যা কুয়োয় পড়ে মারা গেলো। এবার কামার কন্যা সেই কুয়ো থেকে জল তুলে লিতাকে খাওয়ালে সে বেঁচে উঠলো। চোখ খুলেই সে কামার-কন্যাকে দেখে ভাবলো সেই রাজকন্যা। তারপর তাকে সে বিয়ে করে বাড়ি ফিরে গেলো।

লিতার বৌদিরা কামার-কন্যাকে রাজকন্যা বেলবতী ভেবে খুব সমাদর করলো। সাত ভায়ের সাত বৌ মিলে বেশ মজায় দিন কাটাতে লাগলো।

একদিন সাত ভাই ঠিক করলো শিকারে যাবে। তীর ধনুক নিয়ে সাত ভাই হৈ হৈ করে জংগলের পথে বেরিয়ে পড়লো। ক্রমে ওরা গভীর জংগলে ঢুকে পড়লো। হঠাৎ লিতার চোখে পড়লো সেই কুয়োটা। সেখানে জলের খোঁজ করতে এসে সে দেখলো কুয়োর জলে একটা সুন্দর ফুল ভাসছে। লিতার ভারী ভালো লাগলো ফুলটা। তুলে নিয়ে এলো বাড়িতে।

কামারকন্যার হাতে দিয়ে বললো, যে কুয়োর ধারে আমি তোমায় পেয়েছিলাম সেই কুয়োর জলেই পেলাম এই সুন্দর ফুলটি। এটি তুমি নাও।

কামার-কন্যা ফুলটি নিলো বটে। কিন্তু খুশি হলো না। তার অখুশির ভাবটা লিতার কাছে প্রকাশও করলো না, তবে লিতা চলে যাবার পরই ফুলটি ছিঁড়ে কুচি কুচি করে বাড়ির বাইরে ফেলে দিলো। কিন্তু লিতার চোখ এড়ালো না সে ঘটনা। মনে মনে ভারী দুঃখ পেলো লিতা। তবু কিছুই

ললো না তাকে।

কিছুদিন পরে লিতা দেখলো বাড়ির বাইরের সেই ঠাঁইয়ে একটি বেলগাছের চারা গজিয়েছে। সুন্দর নরম-কচিকচি পাতা গজিয়েছে। আলোয় ঝলমল করছে। লিতার মনটা খুশি হলো। ক্রমে সেই বেলগাছ বড়ো হলো। ছোট বড়ো কত বেল ধরলো তাতে। লিতা খুব যত্ন করতো সেই গাছটাকে। রোজ জল দিতো। পাতাগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতো।

একদিন লিতার ঘোড়া ঐ বাগানে ছুটোছুটি করছিল। একটা বেল পড়লো। ঘোড়ার জিনে গেলো আটকে। সহিস ঘোড়াটাকে নিয়ে গেলো বাড়িতে। জিনে একটা বড়ো বেল দেখতে পেয়ে সে ভাড়ী খুশি হলো। বেলটা খাবে বলে যেই ভাঙলো অমনি ওর মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো একটা অপরূপ সুন্দরী মেয়ে। সহিসের কোন মেয়ে ছিলো না। সে ঐ মেয়েকে আদর-যত্ন করে বড়ো করে তুললো।

এদিকে হঠাৎ কামার-কন্যা অসুস্থ হয়ে পড়লো। একেবারে শয্যাশায়ী। তার শরীরের অবস্থা দেখে লিতার মন খারাপ হলো। তার দিন কাটতে চায় না। খাওয়াতে রুচি নেই, কাজে মন নেই, যে রাজকন্যাকে পাওয়ার জন্যে তাকে কষ্ট করতে হয়েছে, সে চলে যাবে! তাকে বিদায় দিতে হবে!

কামার-কন্যার শয্যার পাশে বসে আছে লিতা।

কামার-কন্যা তাকে বললো, তোমার ঐ সহিসের মেয়েটা আমাকে তুক করেছে। তাই আমার অসুখ করেছে। তুমি ওকে মেরে ফ্যালো, দেখবে আমার অসুখ ভালো হয়ে যাবে।

লিতা স্তম্ভিত! বটে! ঐ সুন্দরী মেয়ের পেটে এত শয়তানী!

লিতা হুকুম দিলো, সহিসের মেয়েটাকে মেরে ফ্যালো।

যেমন হুকুম, তেমনি কাজ। ঘাতক এসে সহিসের সুন্দরী মেয়েটাকে এক কোপে মেরে ফেললো। দিন কয়েকের মধ্যেই কামারকন্যা সেরে উঠলো। আবার তার স্বাস্থ্য ফিরলো।

কিন্তু লিতার মনটা কেমন যেন ভালো লাগলো না। ফুলের মতন এমন সুন্দর মেয়েটাকে চোখের সামনে মেরে ফেললো! ওর মনের ভেতর যেন একটা ব্যথা লাগলো।

এরপর অনেক দিন কেটে গেছে।

একদিন একা একা শিকারে বেরিয়েছে। ঘোড়ায় চড়ে শহর ছেড়ে সে বনে মধ্যে প্রবেশ করলো! বনের মধ্যে একটা বিশাল প্রাসাদ। লিতা অবাক হয়ে গেল। প্রাসাদের সামনে এসে ঘোড়া থামলো।

কি আশ্চর্য। দরজা খোলা হাঁ-হাঁ করছে। কোন লোক জন নেই। সাহস করে ঢুকে পড়লো প্রাসাদের ভেতরে। ঝলমল করছে স্ফটিক পাথর। লিতা দোতলায় উঠে হাঁক পাড়লো, কেউ আছো নাকি? প্রতিধ্বনিত হলো— নাকি—।

লিতা দোতলায় একটি ঘরে দেখলো সুন্দর বিছানা। ওর ক্লান্ত শরীরটা মেলে দিলো বিছানায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনতে পেলো তার পাশে বসে দুটি পাখী গল্প করছে। কী মিষ্টি তাদের গলা। পাখী দুটো রাজকন্যা বেলবতীর কথা বলছিলো। কিভাবে কামার-কন্যা বারবার বেলবতী রাজকন্যাকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করেছে আর লিতাকে বোকা বানিয়ে রেখেছে।

লিতার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখে সত্যিই সুন্দর দুটি পাখী খাটের পাশটাতে বসে বসে গল্প করছে। লিতা তাদের জিজ্ঞেস করলো, বেলবতী এখনও বেঁচে আছে? পাখীরা জবাব দিলো, আছে।

লিতা জিজ্ঞেস করলো, সে কোথায়? আমি আবার তার খোঁজে বেরুব।

পাখীরা বললো, আর তার খোঁজ করার দরকার নেই। সে এই প্রাসাদেই একবার আসে, এখানেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে!

আবার কবে আসবে? ব্যাকুলভাবে জানতে চাইলো লিতা।

পাখীরা জবাব দিলো, ঠিক ছ'মাস পরে এই দিনে রাজকন্যা বেলবতী এখানে আসবে।

পাখী দুটো আর কোন কথা না বলে ফুরুৎ করে উড়ে গেলো।

লিতা চেয়ে রইলো তাদের পথের দিকে।

অপেক্ষা করতে লাগলো বেলবতীর জন্যে।

তারপর একদিন সময় এলো। লিতা প্রাসাদের শয়ন কক্ষে বসে অপেক্ষা করছিলো। হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা আলোর ছটার মত বেলবতী এসে হাজির হলো। সোনার মত তার গায়ের রঙ। মাথা ভর্তি ঘন কালো চুল। পিঠের ওপর ছড়ানো। দু-চোখে তার গভীর শান্তি। লিতা এগিয়ে এসে আর্দ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলো, বেলবতী ?

বেলবতী তাকে প্রণাম করলো।

লিতা বেলবতীকে নিয়ে বাড়ি ফিরলো।

অবিশ্যি এর আগেই কামারকন্যাকে শূলে চড়ানো হয়েছিল।

এক সময় এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছিলো সাত রাণী। কিন্তু কী মন্দ কপাল রাজার! সাতরাণীর কারুর ছেলেপুলে হয়নি। রাজা নিঃসন্তান। ভারী দুঃখ তাঁর। সন্তানের আশায় রাজা সাতটি বিয়ে করলেন।

সদা হাসিখুশি রাজার মনটা দুঃখের আগুনে পুড়তে থাকে। মনে মনে

ভাবে, কী হবে আমার রাজ্যপাট। এসব তো সুখের! কই, সুখ আমার কোথায়? তাছাড়া আমার অবর্তমানে এই বিশাল রাজ্যই বা কে ভোগ করবে? আমার বংশ নাশ হবে।

মনের এই দুঃখের কথা কাকেই বা বলেন তিনি! সারাদিন রাজকাজে ডুবে থাকেন কিংবা শিকার অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। অন্ততঃ কিছুটা সময় তো দুঃখ ভুলে থাকা যাবে! আর এই দুঃখ ভোলার জন্যে রাজা রাণীদের কাছ ছেড়ে, প্রাসাদ ছেড়ে, রাজ কার্য ছেড়ে ছুটে বেড়ান পাহাড়ে উপত্যকায় কিংবা কোন জংগলে। হয়ত কোন পাহাড়ী ঝরণার ধারে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকেন তার গান। কখনও কোনও নদীর বুকের ওপর নৌকো করে পার হতে হতে তাকিয়ে থাকেন খোলা আকাশের দিকে। খানিকক্ষণের জন্যে মনটা হালকা হয়ে যায়, ভালো লাগে।

ধর্মকর্ম করেন। ব্রাহ্মণ পুরুষ আর সাধুসন্ন্যিসীদের দেখলে শ্রদ্ধাভক্তি করেন। দানধ্যান করেন। তাঁর এই ধার্মিকতার কথা দেশে-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। নানা জায়গা থেকে সাধুসন্ন্যিসীদের দল আসে। যাগযজ্ঞ হয় প্রায় সারা বছরই।

একবার রাজা শিকার অভিযানে যাবেন। প্রাসাদে ধর্মীয় রীতি অনুসারে পূজাপাঠ শেষ করে দলবল নিয়ে বেড়িয়ে পড়লেন হৈ হৈ করে। এবার গভীর জংগলে এসে পড়লেন রাজা। দূর থেকে দেখতে পেলেন। কে যেন এক জ্যোতির্ময় মূর্তি ধরে তাঁর সামনে এগিয়ে আসছেন। সোনার মত উজ্জল তাঁর গায়ের রং, গায়ে উজ্জ্বল গেরুয়া আচ্ছাদন। হাতে একটি মৃন্ময় পাত্র। কাঁধে ঝুলি। সারা মুখে জ্ঞানের স্বর্গীয় প্রভা।

রাজা এগিয়ে এলেন। ঘোড়া থেকে নেমে প্রণাম করলেন সাধুকে। সাধু মুখে কোন কথা বললেন না। কোন আশীর্বাদ উচ্চারণ করলেন না। বেশ খানিকক্ষণ রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর ঝুলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বার করলেন একটি পাকা আম। সেটি রাজাকে দিয়ে বললেন, এইটি তোমার সাত রাণীকে সমান ভাগে ভাগ করে খেতে বলো। তোমার সন্তান-সন্ততি হবে। মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

রাজা ফলটি গ্রহণ করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে চেয়ে রইলেন। সাধু আর কোন কথা বললেন না। সোজা চলে গেলেন গভীর অরণ্যের দিকে। ঘন

সবুজ গাছ-গাছালির মধ্যে সাধুর অপূর্ব জ্যোতি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো।

রইলো পড়ে শিকারের নেশা। রাজা তাঁর লোকজনদের ফেরার হুকুম দিলেন। হাতী ঘোড়া লোকলস্কর সবাই বনের দিকে পিছন ফিরলো। রাজধানীর দিকে তাদের পথ।

প্রাসাদে ফিরলেন রাজা। নিজের কক্ষে তিনি সাতরাণীকে ডেকে পাঠালেন। অকস্মাৎ রাজা শিকার থেকে ফিরে এসেছেন শুনে রাণীরা ছুটে এসেছেন। কী হলো মহারাজের!

রাজা বড় রাণীকে কাছে ডেকে আমটি দিয়ে বললেন। এইটিকে সমান টুকরো করে তোমরা সাতজন খাও। তোমরা সকলে সন্তানবতী হবে। বনের মধ্যে এক জ্যোতির্ময় সাধুর আশীর্বাদ এই ফল।

বড়ো রাণী ফলটি নিয়ে প্রাসাদের ভেতরে চলে গেলেন।

ছোট রাণী বয়েসে ছোট আর সুন্দরী। সেই বেশিক্ষণ রাজার কাছে কাছে থাকে। এতে ছয় রাণীর ভারী হিংসা। ও নিশ্চয়ই রাজাকে তুক করে বশে এনেছে। এবার ওর যদি ছেলেপুলে হয় তাহলে রাজা তো ওকেই ভালবাসবে। তার চেয়ে বরং ওকে আর ফলের টুকরো দিয়ে কাজ নেই।

বড়ো রাণী আমটাকে ছটি সমান টুকরো করে ছজনের মধ্যে ভাগ করে নিলো। হিংসুটে ছয় রাণী খেলো। ছোট রাণীকে খেতে দিলো না। ওর মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেলো।

ছয়রাণী যে যার অংশটুকু খেলো এবং আর আমের খোসা বাইরে ফেলে দিলো। ছোট রাণী মনের দুঃখে সেটাই কুড়িয়ে খেলো। তবু সাধুর আশীর্বাদের এই ফল। এর যে কোন অংশ খেলেই হবে। পবিত্র মনে ছোট রাণী আমের খোসা খেয়ে তৃপ্তি পেলো।

কিন্তু মন্ত্রপুত ফলের কী গুণ আর মহিমা। হিংসুটে আর নিষ্ঠুর ছয়রাণী সন্তানবতী হলো না। অথচ ভারী আশ্চর্য ছোট রাণী গর্ভবতী হলো। রাজার কাছে যখন এ খবর গিয়ে পৌছলো তখন রাজা খুব খুশি হলেন। তাঁকে আরো ভালো বাসলেন।

এদিকে ছয়রাণী তো রাগে গর্‌গর্‌ করতে লাগলো। ছোটোর ওপর আরো হিংসা আর ঘৃণা করতে লাগলো। ওরা সবাই মিলে মতলব করতে লাগলো, কি করে ওকে জব্দ করা যায়, কি করে ওর সুখের প্রাসাদে আগুন জ্বালা যায়।

ঘৃণা আর প্রতিহিংসা।

ছোট রাণীর মনটা বিষণ্ন হয়। একদিন সে রাজার নিজের কক্ষে ফুলের মতো নরম বিছানায় শুয়ে শুয়ে বলতে লাগলো, মহারাজ, আপনি তো দিনের পর দিন শিকারে যেতে থাকেন গভীর জংগলে। প্রাসাদের কথা তো আপনার মনেই থাকে না।

রাজা তাকালেন রাণীর মুখের দিকে। বললেন, তুমি কি কিছু বলতে চাইছো।

বলছি, আমার সন্তান হলে আপনি খবর পাবেন কি করে।

ছোট রাণীর কথায় রাজা হাসলেন।

রাণী বললো, আপনি হাসছেন। এদিকে ভয়ে ভয়ে আমার প্রাণটা শুকিয়ে যাচ্ছে। জানি না আপনার অবর্তমানে কখন কী হয়।

রাজা ছোটরাণীর মাথায় হাত রেখে বললেন, ভয় পাচ্ছো কেন? আমি যদি প্রাসাদে না থাকি তাহলে তোমার জন্যে বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করে যাবো। প্রাসাদের দ্বারে একটা বিশাল পেটানো ঘড়ি ঝুলিয়ে রাখবো। যখনই তোমার সন্তান হবে, ওরা সেই ঘড়িতে শব্দ করবে। আমি তা শুনেই বুঝতে পারবো। আর একটুও দেরী না করে পৌঁছে যাবো তোমার কাছে।

এরপর একদিন রাজা শিকারে বেরিয়ে গেলেন। প্রাসাদের সদর ফটকে বিশাল পেটানো ঘড়ি টাঙানো হলো। ছোট রাণীর মনে প্রশ্ন জাগলো, সত্যি সত্যিই এই ঘণ্টার শব্দ বনের মধ্যে যাবে? একটু পরখ করলে কেমন হয়?

একথা চিন্তা করে ছোট রাণী প্রহরীকে আদেশ দিলেন ঘড়ি পিটিয়ে শব্দ করতে। হুকুম পাওয়া মাত্র প্রহরী সেই বিশাল ঘড়িতে আঘাত করলো— ঢং—ঢং—ঢং—

প্রাসাদ কেঁপে উঠলো তার শব্দে। বাতাসে ভেসে ভেসে সেই শব্দ পৌঁছে গেলো বনের মধ্যে, রাজার কানে। রাজা ছোটরাণীর সন্তান হওয়ার খুশিতে দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে এসে উপস্থিত হলেন প্রাসাদে। ঢুকলেন ছোট রাণীর ঘরে, কই, তোমার কি হলো? ছোটরাণী বললো, নাঃ। এখনও কিছু হয়নি। ঘড়ির শব্দটা তোমার কানে পৌঁছয় কিনা পরখ করলাম।

ছোট রাণীর এরকম ব্যবহার রাজার ভালো লাগলো না। তিনি রুষ্ট হলেন তার ওপর। তিনি বড়ো রাণীকে ডেকে বললেন, তুমি এর দেখাশুনা করবে।

এর সন্তান প্রসব হলে প্রহরীদের আদেশ করবে ঘণ্টা বাজাতে। তার আগে যেন কেউ ঘণ্টা বাজাবার আদেশ না দেয়।

রাজা এই কথা বলে আবার শিকারে বেরিয়ে গেলেন।

ছোটরাণীর মন খারাপ হয়ে গেলো।

কিছুদিন পর ছোটরাণীর প্রসব যন্ত্রণা শুরু হলো। সে ছটফট করতে লাগলো।

খবর পেয়ে বড়ো রাণী ছুটে এলো। ধরাধরি করে তাকে একটি অন্ধকার ঘরে নিয়ে আসা হলো। ছোট রাণীর চোখ বেঁধে দেওয়া হলো যাতে সে তার নবজাত শিশুটিকে না দেখতে পায়।

অন্ধকার ঘরে ছোট রাণীর যমজ সন্তান হলো। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে।

কিন্তু ছোটরাণী তখন অচৈতন্য। দুষ্ট ছয়রাণী নবজাতক দুটিকে একটি মাটির পাত্রে রেখে দূরের এক গ্রামে এক গর্তে ফেলে দিয়ে এলো। আর ছোটরাণীর পাশে এনে রাখলো পাথরের যাঁতা কল।

জ্ঞান ফিরলে ছোটরাণী যন্ত্রণা কাতর গলায় বললে, দিদি, আমার কি হয়েছে, ছেলে না, মেয়ে?

বড়ো রাণী মুখ ভেঙ্‌চে বললো, ছেলে না মেয়ে? দেখ মুখপুড়ী, তোর কি হয়েছে।

এই বলে সে ছোট রাণীকে পাশে রেখে—দেও ছোট যাঁত কলটিকে দেখালো। ছোট রাণী এ দৃশ্য দেখে আঁৎকে উঠে আবার অজ্ঞান হয়ে গেলো।

ইতিমধ্যে ছোটরাণী প্রসব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বড়ো রাণীর হুকুমে ফটকের ঘড়ি পেটানো হয়েছিলো। তার শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে পৌছে গেলো জংগলে। রাজা ঘণ্টা ধ্বনি শুনে তাড়াতাড়ি প্রাসাদে ফিরে এলেন। কিন্তু যখন তিনি ছোট রাণীর পাথরের যাঁতাকল প্রসবের কথা শুনলেন তখন অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। তার ওপর তাঁর রাগও হলো। ছোট রাণীকে তিনি খুবই ভালবাসতেন, তাই তার কাছ থেকে তিনি সন্তান আশা করেছিলেন। কিন্তু তা হলো না। ছোট রাণীর যখন জ্ঞান ফিরলো তখন তিনি তার পাশেই ছিলেন,

বললেন, রাণী বড়ো দুঃখের সঙ্গে বলছি, তুমি আর আমার রাণী হওয়ার যোগ্য নও। রাজপ্রাসাদে আর তোমার ঠাঁই হবে না। এখন থেকে তুমি ক্ষেতের কাক তাড়িয়ে বেড়াবে।

রাজার নিষ্ঠুর আদেশে আদরের ছোটরাণী গাঁয়ের রাখালী হলো। ভোর না হতেই তাকে যেতে হবে মাঠে মাঠে—সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে থেকে সে কাক তাড়িয়ে বেড়াবে। এই হলো তার কাজ।

পরের দিন এক কুমোর তার বউ গ্রামের পথে বেরিয়ে গর্তে দুটি ফুটফুটে সন্তান দেখতে পেলো। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। অবাক হয়ে গেলো তারা। তাড়াতাড়ি দুটি শিশুকে তারা কোলে তুলে নিলো। ওদের কোন ছেলেপুলে ছিলো না। ঈশ্বরের দান মনে করে ওরা শিশুদের নিয়ে এলো ওদের কুটিরে। রাজপুত্র আর রাজকন্যা ঠাঁই পেলো কুটিরে।

কুমোর রাজপুত্রের নাম রাখলো 'অনমোল'। এর মানে হলো অমূল্য। আর রাজকন্যার নাম কদলী। কুমোরের বাড়িতে রাজপুত্র আর রাজকন্যা বড়ো হতে লাগলো। মাঠে মঠে খেলে বেড়াতো দুটি ভাইবোন।

একদিন অনমোল কুমোরকে বললো, বাবা, আমাকে একটা ঘোড়া এনে দাও। অবিশ্যি তার লাগামটা সোনার হওয়া চাই। আমি ওটার সঙ্গে খেলবো।

কুমোর কাঠের ঘোড়ার খেলনা এনে দিলো।

একদিন অনমোল আর কদলী সেই কাঠের ঘোড়াটিকে নিয়ে গ্রামের বিশাল ঝিলের ধারে খেলা করছিলো। সেখানে রাজার ছয়রাণীও এসেছিলো অবগাহন করতে। তারা অনমোল আর কদলীকে দেখে অবাক হলো। এমন সুন্দর ছেলে মেয়ে এ গাঁয়ে এলো কোথা থেকে। তাহলে কি সেই ছেলে মেয়ে দুটি! তাহলে ছোট রাণীর ছেলে মেয়ে বেঁচে আছে? মনের মধ্যে সন্দেহ দানা বাঁধতে লাগলো।

তারা অবাক হয়ে দেখতে লাগলো, ছেলেটি আর মেয়েটি কাঠের ঘোড়াটিকে ঝিলের ধারে এনে বলছে, কাঠের ঘোড়া জল খা।

একবার ছেলেটি বলে। আর একবার মেয়েটি বলে।

ছয়রাণী তো অবাক। ওদের কাছের এগিয়ে এসে বললো, বাছা, কাঠের ঘোড়া কি জল খেতে পারে?

মেয়েটি চট করে জবাব দিলো। কোন রাণীর কখনও যাঁতাকল বাচ্চা হয়?

ছয় রাণী একেবারে থ। এই পুঁচকে ছেলেমেয়েগুলো বলে কি? ওদের সন্দেহ আরও ঘণীভূত হলো। তাহলে এরাই ছোটরাণীর ছেলেমেয়ে। এই গাঁয়েই তো ওদের ফেলে দিয়েছিলাম।

ছয় রাণী ফিরে এলো প্রাসাদে। বিছানায় গিয়ে শুলো। সাত দিন তারা উঠলো না।

রাজা খোঁজ খবর নিলেন। জানতে চাইলেন, তোমাদের কি হয়েছে।

রানীরা জবাব দিলো, আমাদের কঠিন অসুখ।

রাজবৈদ্য দেখেন নি?

তাঁকে খবর দিইনি?

রাজা বিস্মিত। সে কী! রাজবৈদ্যকে খবর দাও নি কেন?

তাঁর ওষুধে সারবে না?

তাহলে?

গ্রামের কুমোরের ছেলেমেয়ের ফুসফুসের রক্তে স্নান করলে আমাদের অসুখ সারবে।

রাজা ওদের কথা শুনে খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, তুচ্ছ ব্যাপারকে এত বড়ো করার দরকার কি? অসুখ করেছে সেরে যাবে। ওঠ, খাও দাও, বিশ্রাম করো। আর আমি লোক পাঠাচ্ছি কুমোরের ছেলে মেয়েদের ধরে আনার জন্যে। তোমাদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

রাজার হুকুমে দুই সৈনিক কুমোরের নয়নের মণি দুই ছেলেমেয়েকে ধরে নিয়ে গেলো বনের মধ্যে। তাদের মেরে ফেলে দুটি ফুসফুস নিয়ে যাবে প্রাসাদে। ওরই রক্তে ছয় রাণী স্নান করে সুস্থ হয়ে উঠবে।

রাজার দুই সৈনিক কুমোরের ছেলে মেয়েকে টেনে নিয়ে গেলো জংগলে। সেইখানে তাদের হত্যা করা হবে। কিন্তু জংগলের মধ্যে ঢুকে কচি কাঁচা ছেলে মেয়ে দুটোকে দেখে ভারী মায়া হলো। এমন সুন্দর শিশুদের হত্যা করতে তাদের মন চাইলো না। তারা শিশুদের জংগলে ছেড়ে দিলো। তার বদলে

ছুটি বুনোর শূয়োর মেরে তাদের ফুসফুস নিয়ে ওরা প্রাসাদে ফিরে এলো!

ছয় রাণী শূকরের ফুসফুস সারা গায়ে বুলিয়ে নিয়ে স্নান করলো, কী আনন্দ তাদের। এবার তারা অসুস্থতার ভাবটা ঝেড়ে ফেলে দিলো। যাক্, এবার পথের কাঁটা দূর হলো।

কিন্তু ঈশ্বর যাকে রাখেন, তাকে মারে কে?

এদিকে জংগল থেকে শিশু ছুটি আবার ফিরে এলো কুমোরের বাড়ি। আবার সুখে দুঃখে তেমনি বড়ো হতে লাগলো। মাঠে মাঠে খেলে বেড়ায়। আকাশের নীল রঙ দেখতে দেখতে, মেঘের খেলা দেখতে দেখতে কখন বেলা ফুরিয়ে আসে। পাখীরা যেমন সন্ধ্যেবেলায় নীড়ে ফেরে, অনমোল আর কদলী তেমনি গোধূলিবেলার পড়ন্ত সূর্যের রঙ সারা গায়ে মেখে বাড়ি ফিরে আসে।

একদিন কদলী কুমোরের কাছে এসে আব্দার করলো, বাবা, আমাকে একটা ধান ঝাড়ার ঝুড়ি এনে দেবে?

কুমোর পরের দিন তাকে ঝুড়ি এনে দিলো। কদলী সেটা পেয়ে ভারী খুশি হলো। ভাই বোনে সেই ঝুড়িটাকে নিয়ে ফুটন্ত ফুলের মত বাগানে দোল খেয়ে খেয়ে খেলা করছিলো। গান গাইছিলো।

আর ঘটনাচক্রে সেই বাগানে সেদিন ফুল তুলতে এসেছিলো ছয়রাণী। ওদের দেখতে পেয়ে ছয় মাথা এক জায়গায় জড়ো হলো। ফিসফিসিয়ে বলতে লাগলো, কি ব্যাপার বলো দেখি, ছেলেমেয়ে দুটোকে রাজামশাই তো মেরে ফেলার হুকুম দিলেন। ওরা আবার বেঁচে উঠলো কী করে?

ছয় রাণী বাগানের এদিক ওদিক, এ মাথা সে মাথা ঘুরে ঘুরে ঐ ছেলে মেয়ে দুটিকে দেখতে লাগলো। ওরা সে সব কথা জানতেও পারেনি। মনের আনন্দে ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কদলী পাখীর স্বরের মত মিহি গলায় গান গাইছে।

ধান ঝাড়ুনি কালো পাখী
বেড়াস কোথায় আকাশ সীমায়,
ধান ঝাড়তে কুঁড়ো খেতে
মোদের বাড়ি আয় না হেথায়।

ছয় রাণী অবাক। মেয়ে এ কী গান গায়। ধান ঝাড়ুনি কালো পাখী! সে আবার আকাশ থেকে নেমে এসে ওদের বাড়ি ধান ঝেড়ে দেবে, কুড়ো খাবে! খিলখিল করে হেসে উঠলো ছয়রাণী। ওরা বললো, এই খুকু, কী আবোল তাবোল বকছিস? পাখীতে কখনও ধান ঝাড়তে পারে?

কদলীও হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে উত্তর দিলো, রাণীর কখন ও যাঁতাকল ছেলে মেয়ে হয় নাকি?

কদলীর জবাব শুনে ছয়রাণী তো খাপ্পা। রাগে গজ্‌গজ্‌ করতে প্রাসাদে এসে আবার বিছানা নিলো। রটিয়ে দিলো রাণীদের আবার অসুখ করেছে। খবরটা রাজার কানেও পৌছলো। তিনি এলেন রাণীদের দেখতে। ছয়রাণী রাজাকে বললো, তুমি আমাদের সঙ্গে ছলনা করছো? কই, কুমোরের ছেলে মেয়ে মরে নি? ওদের ফুসফুস না এনে দিলে আমাদের রোগ কোনদিন সারবে না।

রাজা আবার দুজন সৈনিককে ডেকে পাঠিয়ে হুকুম দিলেন কুমোরের ছেলেমেয়েকে বধ করে ওদের ফুসফুস ছিঁড়ে আনতে।

এবার সৈনিক দুজন কুমোরের ছেলেমেয়েকে জংগলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করলো। বুকের ভেতর থেকে তাদের ফুসফুস ছিঁড়ে এনে দিলো রাণীদের হাতে। রাণীরা এবার খুব খুশি হলো।

এদিকে ঘাতক যেখানে অনমোলকে মেরেছিল, সেখানে পড়েছিল তার রক্ত। তাই থেকে একটি বিশাল গাছ হলো। বাঁশগাছের মত দেখতে। আর কদলীর রক্তে সেখানে গজিয়ে উঠলো একটা সুন্দর কলাগাছ। বাঁশগাছের মত লম্বা গাছটার মাথায় সুন্দর ফুল ফুটেছিলো।

একদিন এক পাখীশিকারী ঘুরতে ঘুরতে সেই বনে এসে হাজির হলো। বাঁশগাছের মত লম্বা সেই অজানা গাছটাকে দেখে ভারী অবাক হলো। গাছের মাথায় থোকা থোকা নানারঙের ফুলঝরির মত ফুল দেখে মুগ্ধ হলো সে। সে ভাবলো, যদি সে এই গাছের সুন্দর ফুল রাজার কাছে নিয়ে যায়। তবে রাজা খুশি হয়ে তাকে পুরস্কার দেবে। কারণ এমন ফুল তো সচরাচর দেখা যায় না।

এই কথা ভেবে পাখী ধরা লোকটি যেই সেই গাছের কাছে এগিয়ে এলো, অমনি কলাগাছ মিষ্টি স্বরে গান গেয়ে উঠলো,

সোনামণি ভাইটি আমার
বলছি তোমায় শোনো,
পাখী ধরা আসছে ধেয়ে
প্রমাদ আছেই জেনো।
ফুল ছিঁড়বে, ছিঁড়বে পাতা
নেবে তোমার প্রাণ,
গগন-তলে ঠাঁই করে নাও
বাঁচাও তোমার জান।

পাখী ধরা লোকটি অবাক। তার চোখের সামনে লম্বা গাছটি হঠাৎ তার
ল পাতা নিয়ে সোজা উঠে দাঁড়ালো মাথা তুলে। আকাশের কোল ঘেঁষে
ইলো। লোকটি ফুল-পাতা কিছুই ছিঁড়তে পারলো না। মনটা তার
ারাপ হয়ে গেলো। সে রাজ-প্রাসাদে ফিরে এসে জানালো সেই অদ্ভুত ঘটনার
থা।

রাজামশাই এই অদ্ভুত ঘটনা শুনে সেই দুজন সৈনিককে পাঠালেন যারা
মোরের ছেলে আর মেয়েকে হত্যা করেছিল। তাদের বললেন ঐ গাছের
ন্দের ফুল তুলে আনতে। রাজার দুই সেনা আবার ধেয়ে এলো সেই জংগলে।
দের আসতে দেখেই কদলী আবার পাখীর মত মিষ্টি স্বরে গান গেয়ে উঠলো,

সোনামণি, ভাইটি আমার,
বলছি তোমায় শোনো,
রাজার সেনা আসছে ধেয়ে,
প্রমাদ আছেই জেনো।
ফুল ছিড়ঁবে, ছিঁড়বে পাতা
নেবে তোমার প্রাণ,
গগনতলে ঠাঁই করে নাও
বাঁচাও তোমার জান।

কদলীর গান শেষ হতে না হতেই দীর্ঘ গাছটা ফুল-পাতা নিয়ে আকাশ

মায়ের কোলে ঠাঁই করে নিলো। সেনারা অবাক হয়ে দেখলো। ফুলের নাগাল পেলো না। মন ভার করে তারাও ফিরে গেলো প্রাসাদে। রাজাকে জানালো সেই অদ্ভুত ঘটনা।

রাজা অবাক হয়ে গেলেন? ভারী আশ্চর্য তো! নিজেই যাবেন বলে ঘোষণা করলেন লোকলস্কর, সেনা সঙ্গে নিয়ে রাজা স্বয়ং আসছেন বলে। নিজের হাতে তুলবেন সেই ফুল।

এদিকে রাজাকে আসতে দেখেই কদলী আগের মত সুর করে গাইতে লাগলো,

সোনামণি, ভাই আমার,
বলছি তোমায় শোনো,
মোদের পিতা আসছে ধেয়ে,
প্রমাদ আছেই জেনো।
ফুল ছিঁড়বে, ছিঁড়বে পাতা
নেবে তোমার প্রাণ,
গগনতলে ঠাঁই করে নাও
বাঁচাও তোমার জান।

গান শেষ হতে না হতেই গাছ মাথা তুললো আকাশে। নরম সবুজ পাতা আর নানা রঙের ফুল আকাশের গায়ে ঠেস দিয়ে বাতাসে দুলতে লাগলো। রাজা অবাক হয়ে এ দৃশ্য দেখলেন। ফুল তোলা তাঁর হলো না।

এবার রাজা নিয়ে এলেন ছয় রাণীকে। বললেন, আমি পারি নি। তোমাদের ছ'জনকে ফুল তুলে আনতে হবে।

ছয় রাণীকে আসতে দেখে কলাগাছ তার সোনামণি ভাইকে আগের মতই গাইতে গাইতে সাবধান করে দিলো তার মায়ের শত্রুরা আসছে। আর অমনি গাছ সটান উঠে দাঁড়ালো। আকাশের কোলে মাথা রাখলো। ছয়রাণী ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো আকাশের দিকে। মনে হলো নীল চাদরে কে যেন নানা রঙের ফুল আর নরম সবুজ রঙের পাতা এঁকে রেখেছে। ফুল তোলা হলো না তাদের।

রাজা হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাহলে এ পৃথিবীতে কে এমন আছে যে এই গাছ থেকে ফুল তুলতে পারবে! একে একে সবাই হেরে গেলো। রাজার স্পর্ধাও মাথা নোয়ালো! এমন সময় সময় রাজার মনে পড়লো ছোটরাণীর কথা। তাকে ডেকে আনলে কেমন হয়? সে তো এখনও মাঠে মাঠে কাক তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

রাজা তার দুই সৈনিককে পাঠালেন ছোটরাণীকে নিয়ে আসার জন্যে!

ছোটরাণীর দিন কাটে দুঃখে। বড় হতভাগিনী সে। রাজার প্রিয়পাত্রী ছিলো সে। অজানা কোন্ অপরাধে তাকে প্রাসাদ ছাড়তে হলো; রাজার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হলো। নিজের সন্তানের খবর জানতে পারলো না, বরণ করে নিতে হলো এই দুঃখের জীবন। কেন? কীসের জন্য? বারবার এসব প্রশ্ন জেগেছে তার মনে। কোন উত্তর সে খুঁজে পায়নি। বরং পেয়েছে দুঃখ—স্বামী হারানোর দুঃখ, সন্তান হারানোর দুঃখ। খেতে পায় না। শরীর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কাপড় জোটে না। একখানি কাপড় কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে সেলাই করে পড়ে থাকে।

রাজার সেপাইরা এসে প্রথমে তাকে চিনতে পারে নি। অনেক কষ্টে চিনতে পেরে বললো, রাণীমা, আপনাকে নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে। আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। বিলম্ব করবেন না।

রাজার সেপাইদের দেখে ছোটরাণীর মুখখানা ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। ভয়ে কাঁপা কাঁপা গলায়সে প্রশ্ন করলো, কেন বাবা, এই গরীব দুঃখীকে নিয়ে আবার টানাটানি করার দরকার কি?

সেপাইরা সে কথার কোন জবাব দিলো না। ছোটরাণীকে নিয়ে ওরা জংগলে রাজার সামনে হাজির করলো। রাজা ছোটরাণীকে বললেন, ঐ গাছের ফুল তোমায় পেড়ে আনতে হবে।

রাজার আদেশ পেয়ে ছোটরাণী তার শীর্ণ দেহখানা টানতে টানতে কোনরকমে এগোতে লাগলো গাছটার দিকে অমনি কলাগাছ পাখীর চেয়ে মিষ্টি সুরে আকাশ কাঁপিয়ে গান জুড়ে দিলো:

সোনামণি, ভাইটি আমার,
বলছি এবার শোনো,

মা আমাদের আসছে ধেয়ে
নেইকো প্রমাদ জেনো।
ছিঁড়বে নাকো ফুলও পাতা,
নেবেও নাকো প্রাণ
মায়ের পায়ে নোয়াও মাথা,
রাখো মায়ের মান।

ছোটরাণী সেই বিশাল গাছের নীচে এসে দাঁড়াতেই গাছ মাথা নীচু করলো। অসংখ্য ফুল ঝরে পড়লো তার মাথায় আর গায়ে। ছোটরাণী তার শীর্ণ হাতখানি বাড়িয়ে যেমন ফুল তুলতে যাবে, অমনি কাঁদ কাঁদ গলায় গাছ বলে উঠলো :

মাগো আমার গাছটি কেটে
মুক্ত আমায় করো।
আমি তোমার প্রাণের বাছা
জড়িয়ে বুকে ধরো।

ছোটরাণী একেবারে থ। তার মুখে রা নেই! চোখ দুটো স্থির। রাজার মুখে কথা নেই। লোকলস্কর, সেপাই সেনা সবাই অবাক হয়ে শুনলো ফুল গাছটির আবেদন। হঠাৎ সকলকে চমকে দিয়ে কলাগাছ পাখীর চেয়ে মিষ্টি স্বরে কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলো :

মাগো, আমার গাছটি কেটে
মুক্ত আমায় করো।
আমি তোমার নয়ন-মণি
জড়িয়ে বুকে ধরো।

ছোটরাণীর হুকুমে গাছ দুখানি কাটা হলো। দুটি গাছের গুড়ি থেকে দুটি ফুলের মতো সুন্দর বালক বালিকা বেরিয়ে পড়লো। দুইজনে ছুটে এলো

মায়ের গলা জড়িয়ে ধরলো। তারা মায়ের গালে চুমু খেলো। ছোটরাণী তাদের কাছে পেয়ে কেঁদে উঠলো। তার প্রাণের সন্তানদের কত কষ্টই না হয়েছিল!

এদিকে ছয়রাণীর মধ্যে তখন তুমুল বিবাদ শুরু হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই দাবী করছে এই ছেলে মেয়ে দুটি তারই। ওদের ঝগড়া দেখে ছোটরাণী নতুন করে প্রমাদ আশংকা করতে লাগলো। তখন রাজা এগিয়ে এলেন ওদের ঝগড়া মেটাতে। তিনি বললেন, তোমরা থামো, কে সত্যিকারের মা এখনি তার পরীক্ষা হবে। তোমাদের মধ্যে যার স্তনের দুধ ঐ বালক-বালিকার মুখে গিয়ে পৌছবে, সেই সত্যিকারের মা হবে।

ছয়রাণী এবার চরম পরীক্ষার মধ্যে পড়লো? তাদের স্তনে কোন দুধ না থাকায় তারা রাজার বিচারে পরাস্ত হলো। আর ছোটরাণীর স্তন থেকে তাঁর সন্তানদের জন্য ঝরণা ধারার মত দুধ ঝরতে লাগলো। রাজা অভিভূত হয়ে গেলেন। ছোটরাণীই এই দুই সন্তানের মা সে কথা প্রমাণ হয়ে গেলো। ছয়রাণীর ওপর রাজা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের শাস্তি দিলেন। রাজ্যের এক প্রান্তে একটি দুর্গে তাদের বন্দী করে রাখা হলো। তাদের জন্য বরাদ্দ হলো গমের ছাতু আর জল।

রাজা ছোটরাণী আর তার দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে ফিরলেন রাজপ্রাসাদে। রাজধানীর ঘরে ঘরে আলোর রোশনাই দেখা দিলো। প্রাসাদে আবার উৎসব চলতে লাগলো। ছোটরাণী রাজার পাশে সোনার সিংহাসনে বসলেন। আর সোনার টুকরো দুই ছেলে রাজা ও রাণীর দুই পাশে বসলো।

দুঃখের রাত্রি কেটে গিয়ে সুখের সূর্যোদয় হলো।

রত্ন-পাহাড়

একটি গ্রামে এক বুড়ী থাকেতা।

তার একটি মাত্র ছেলে।

বুড়ী ভেড়ার লোম পরিষ্কার করে দু-চার পয়সা রোজগার করত। আর তাই দিয়েই তাদের সংসার চলে যেতো।

কিন্তু বুড়ী আর কতদিন কাজ করবে। একদিন ছেলেকে বললো, দেখ বাবা, আমি আর কাজ করতে পারছি না। তুই একটা কাজকর্ম দেখ।

ছেলেটি কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু কোথাও কাজ পেল না। মনটা খারাপ হয়ে গেলো। কাজ না পেলে তাদের সংসার চলবে কি করে ?

সে একদিন সকাল বেলায় উঠে বেরিয়ে পড়লো। আজ যে করেই হোক তাকে একটা কাজ খুঁজে বার করতেই হবে।

হাঁটছে তো হাঁটছেই। শহর-গঞ্জ-গ্রাম ছাড়িয়ে সে অনেক দূরে এসে পৌছলো। সেখানে একটি বিরাট প্রাসাদ। লোকলস্কর অনেক। একজনকে ডেকে সে জিজ্ঞেস করলো, ভাই, এখানে কোন কাজ পাওয়া যায় ?

লোকটি তাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে মালিকের কাছে আবেদন করতে পরামর্শ

দিলো। বুড়ীর ছেলে সাহসে ভর করে ভেতরে ঢুকলো। সামনেই হাতির দাঁতের চৌকির ওপর বসেছিলো মালিক। তার গলায় আট ছড়া হীরের মালা। হাতে আটখানি হীরে জড়ানো আংটি। লোকটিকে দেখে বুড়ীর ছেলের বেশ দয়ালু মনে হলো। সে বললো, আমার একটি কাজের দরকার। আপনি যদি দয়া করে আমার একটি কাজ দেন তবে বেঁচে যাই।

কাজ ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। যে কোন কাজ হলেই হলেই চলবে।

চলবে ?

আজ্ঞে—

বেশ। তাহলে এসো।

কবে থেকে ?

এক্ষুনি।

আমার মাকে যে বলে আসা দরকার।

বেশ বলে এলো।

আমি বরং কাল থেকে কাজে যোগ দেব।

বেশ· বেশ। তাই এসো। যেমন তোমার খুশী।

বুড়ীর ছেলে চলে গেল।

পরের দিন সে কাজে যোগ দিল।

কিন্তু কাজ কিছু নেই। সারা দিন বসে থাকতে হয়। ঠায় বসে থাকা। এমন কি টুকিটাকি ফাই ফরমাস খাটাও নয়।

একদিন গেল। দুদিন গেল। তিন গেল।

তাঁর আর ভালো লাগে না। অন্যান্য লোকেদের জিজ্ঞেস করলে তারা কোন জবাব দেয় না। ভারী অদ্ভুত লাগে তার।

চতুর্থ দিনে সে নিজেই গেলা মালিকের কাছে।

জানতে চাইলো, আমার কাজটা কি ?

কেন ?

বসে বসে ভালো লাগে লাগছে না।

গল্প করো।

তাই বা কতক্ষণ পারা যায় ?

বেড়াতে যাও।

কোথায় ?

আশে পাশে।

আমার জন্যে কি কোন কাজ নেই ?

আছে।

কই ?

সময় হলেই তোমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলবো। অমন উতলা হয়ো না।

ছেলেটি আর কিছু না বলে চলে গেলো।

দিন কয়েক পরে মালিক ডেকে পাঠালো তাকে।

আমাকে কিছু বলবেন ?

হ্যাঁ, কাজের কথা বলব।

বলুন কী করতে হবে ?

তোমায় কসাই বাড়ী যেতে হবে।

কেন ?

একটা বড় সড় মোষ জবাই করে তার ছালটা ছাড়িয়ে আনতে হবে। তুমি আজই রওনা হয়ে পড়ো। তোমার সঙ্গে দুজন লোক যাবে। আসার পথে বাজার থেকে বড় মাপের দুটো বস্তা নিয়ে আসবে। ভুলে যেয়ো না যেন।

না—না। ভুলব কেন! এটাই তো আমার কাজ।

বুড়ীর ছেলে রওনা হয়ে গেল।

দুদিন পরে ওরা ফিরল।

মালিক খুব খুশি।

বাঃ। তুমি তো খুব কাজের ছেলে। পরশুদিন আমরা শিকারে বেরোরো। দুটো উট আনিয়ে রাখব।

ছেলেটি মাথা নেড়ে চলে গেলো।

পরশু দিন এসে গেল।

ধূসর রঙের দুটি সবল উট এসে দাঁড়ালো প্রাসাদের সামনে। একটাতে রাখা হল মোষের চামড়া আর বস্তা দুটি। আর একটাতে বসলো মালিক। যেটিতে মালপত্তর রাখা হলো, সেটি বসলো চালক আর ছেলেটি।

ওরা রওনা হয়ে পড়লো।

দুদিন দু রাত ওরা চললো।

শেষটায় ভোর বেলায় ওরা এসে থামলো একটা পাহাড়ের নীচে। তখন সবে মাত্র সূর্য উঠেছে। সোনালী আলোয় পাহাড়ী অঞ্চলটা রঙীন হয়ে উঠেছে।

মালিক বলল, এবার, এবার সব নেমে পড়। খাবার-দাবার খেয়ে নাও কিছু। অনেক পরিশ্রম হয়েছে।

ছোট্ট একখানা সামিয়ানা খাটিয়ে ভোজের আয়োজন হল। ভাজা যবের পুরি, হালুয়া, আর মিষ্টি।

বুড়ীর ছেলে বেজায় খুশি। এমন ভালো ঘিয়ের রান্না জীবনে আর কোন দিন সে খায়নি।

মালিক বললো, এবার মোষের চামড়াটা বিছিয়ে নাও।

ছেলেটি মোষের চামড়া বিছিয়ে নিলো।

মালিক বললো, ওর ওপর এবার শুয়ে পড়।

ছেলেটি চামড়ার বিছানায় শুয়ে পড়লো।

মালিকের সঙ্গের দু'জন লোক তাড়াতাড়ি চামড়া গুটিয়ে সেলাই করে ফেললে। বুড়ীর ছেলে ওর ভেতরে রয়ে গেল।

সে ভেতর থেকে বললে, মালিক, আমাকে বাইরে বের করবেন না? এখানে আমার কষ্ট হচ্ছে।

হ্যাঁ বাছা। খানিক পরেই তোমাকে বের করে নেবো। এর পরে তোমার আসল কাজ শুরু হবে।

বলেই সঙ্গের লোকজনকে কী ইশারা করলো।

সঙ্গে সঙ্গে লোক দুজন চামড়ায় মোড়া ছেলেকে একটা উঁচু জায়গায় রেখে এল। খানিক পরে বড় বড় দুটি বাজপাখী এসে সেটিকে নিয়ে গেল একটি পাহাড়ের উঁচু চূড়ায়।

ঠোঁট আর নখ দিয়ে চামড়ার সেলাই খুলে ফেলল। দেখে একটা জ্যান্ত মানুষ। বাজপাখী দুটি থতমত খেয়ে উড়ে গেল।

মালিক পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে।

সে চীৎকার করে বললে, ওহে ছোকড়া, তোমার পায়ের কাছে দেখ, হাজার

হাজার হীরে-জহরৎ পড়ে আছে। ওগুলো আমার দিকে ছুড়ে দাও।

বুড়ীর ছেলে চারপাশে তাকিয়ে দেখে ঝলমলে হীরে জহরৎ, পান্না। কী রঙের বাহার। পাহাড়ের ওপরটা ঝলমল করতে লাগলো। ছেলেটি দু হাত ভরে সেগুলি তুলে ছুড়ে ফেলতে লাগলো নীচে। মালিক আর তার সঙ্গের দুজন লোক সেগুলিকে কুড়িয়ে বস্তাবন্দী করতে লাগলো।

ছেলেটি হীরে-জহরৎ-পান্না ছুঁড়তে ছুঁড়তে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তার মনে পড়ল, সে নামবে কখন? কিভাবেই নামবে। চীৎকার করে বলল, মালিক, আমি নামবো কেমন করে? রাস্তা কোথায়?

মালিকও নীচে থেকে চীৎকার করে বলতে লাগল, ভয় কি বেলা শেষে আমি তোমায় নামিয়ে আনবো। এখন তুমি শুধু হীরে-জহরৎ ফেলো।

ছেলেটি আবার ফেলতে লাগলো রাশি রাশি।

এদিকে দুপুর গড়িয়ে আসতে লাগল। রোদের তেজ কমে আসতে লাগল। বুড়ীর ছেলেটি চিন্তিত হয়ে পড়ল। মালিক একবারও তাকে নামানোর কথা বলে না। তার দুটি বড় বস্তা ভর্তি হল। দড়ি দিয়ে ভালো করে বাঁধা হলো। উটের পিঠের ওপর যত্ন করে বোঝাই করা হলো। মালিক উটের পিঠের ওপর গিয়ে বসলো। বুড়ীর ছেলে পাহাড়ের ওপর থেকে চীৎকার করে বললে মালিক, আমি নামবো কি করে?

ওর আর্তনাদ দূরের পাহাড়গুলিতে প্রতিধ্বনিত হলো।

মালিক হো হো করে হেসে উঠল। সে-হাসিও প্রতিধ্বনিত হলো। মালিক চীৎকার করে বললে, ওখানে তোমার অনেক বন্ধু আছে। ওদের জিজ্ঞেস করলেই ওরা বলে দেবে। কোন ভয় নেই। তুমি চিন্তা করো না।

এই বলে মালিক উটের পিঠে চড়ে চলে গেল।

ছেলেটি মালিকের পথের দিকে চেয়ে হাউ হাউ করে কাঁদলে। তারপর চারপাশে তাকিয়ে দেখলে অনেক নরকঙ্কাল এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। ওসব দেখে সে আঁৎকে উঠল। চীৎকার করে উঠলো ভয়ে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, বড় বড় দুটো বাজপাখী উড়ছে। তীক্ষ্ণ স্বরে চীৎকার করছে। ওপরের আকাশ কাঁপছে থর থর করে, সেই শব্দে বাতাস যেন কাঁপছে।

একটা বাজপাখী থপ্ করে ঠোঁটে করে ওর ঘাড় ধরে নিলো। ছেলেটি ওর পা দুটো দু হাত দিয়ে ধরে ঝুলে পড়ল। পাখীটা উঁচু আকাশে ওড়বার চেষ্টা করে। ছেলেটিও ওর পা ধরে থাকে শক্ত করে। এভাবে অনেকক্ষণ কাটলো। পাখীটা পাহাড়ের নীচের দিকে নামতেই ছেলেটি লাফ দিল। মাটিতে পড়েই সে ছুট দিলো।

বাজপাখীটা আকাশে উড়ে ব্যর্থ আক্রোশে বহুক্ষণ-চীৎকার করলো। তারপর হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে এসে বসলো পাহাড়ের চূড়ায়।

বুড়ীর ছেলে বহু পথ পার হয়ে আবার উপস্থিত হলো সেই মালিকের বাড়িতে। একমুখ দাড়ি। চেহারাটা বেশ শীর্ণ।

মালিকের বাড়িতে এসে আগের মত বললে, প্রভু, আমায় একটা কাজ দেবেন। অনেক দিন কিছু খেতে পাইনি। দুটো খেতে দেবেন।

মালিক ওকে চিনতে পারেনি।

ওর কথায় দয়া দেখালে, কি কাজ করবে।

যে কোন কাজ করব।

মালিক হাঁক দিলে, ওরে, ভেতর থেকে কিছু খাবার পাঠিয়ে দে।

রূপোর থালায় খান কয়েক মিষ্টি নিয়ে এল।

বুড়ীর ছেলে সেগুলি গো-গ্রাসে খেলো। ওর কাজের ব্যবস্থা হল। পরের রবিবার মালিকের সঙ্গে ওকে শিকারে বেরোতে হবে এ কয়দিন ওকে বিশ্রাম করতে দেওয়া হল।

রবিবার এল।

একটা বিরাট মহিষ মেরে তার চামড়া ছাড়িয়ে রাখা হলো। সঙ্গে দুটো বড় বড় থলি নেওয়া হল। উট এল দুটি। সঙ্গে দুজন লোক নেওয়া হল। সব আগের মত ব্যবস্থা হলো।

সেই পুরনো পাহাড়ের কাছে ওরা এসে পৌছলো।

সামিয়ানা খাটিয়ে টিফিন খাওয়া হল।

মালিক ওকে বললে, মোষের চামড়াটা বিছিয়ে নাও।

ছেলেটি তাই করলো।

মালিক বললে, তুমি ওর ওপর শুয়ে পড়।

ছেলেটি বললে, আমি শুতে জানি না।

সে কি তুমি উপুড় হয়ে শুতে জানো না?

মালিক তো অবাক।

ছেলেটি বলল, না জানি না। আপনি একটু দেখিয়ে দিন।

মালিক অন্য দুজন লোককে বললে, তোরা শুয়ে দেখিয়ে দে।

ওরা বললে, প্রভু, আমাদের উপুড় হয়ে শোয়া বারণ।

কোন উপায় নেই দেখে মালিক উপুড় হয়ে শুয়ে বললে, দেখে নে।

বুড়ীর ছেলে ততক্ষণে চটপটে চামড়াটা মুড়ে ফেললে। মালিক ভেতর থেকে চীৎকার করলে, ছোকরা এসব কী করচিস। আমি তোর প্রভু। আমার সঙ্গে ঠাট্টা করচিস কেন? ছেড়ে দে।

বুড়ীর ছেলে কোন জবাব দিল না। ঠাণ্ডা মাথায় মাথায় মালিককে সেলাই করলো সে আর অন্য দুজন লোক ঐ জায়গা থেকে সরে পড়ল।

খানিক পরে বাজপাখী ওটাকে নিয়ে গেল পাহাড়ে। ঠোঁটে করে তারা সেলাই কেটে ফেললো। মালিক চামড়ার খোলস থেকে বেড়িয়ে চীৎকার করতে লাগলো।

ওহে ছোকরা, আমাকে নামিয়ে নাও।

বুড়ীর ছেলে বললো, হীরের টুকরো ছুড়ে দাও। রাশি রাশি।

মালিক হীরে-জহরৎ-পান্না ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো।

বুড়ীর ছেলে কুড়িয়ে কুড়িয়ে বস্তায় ভরতে লাগল। ক্রমে বস্তা দুটো ভরে গেলে বুড়ীর ছেলে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে বললে,

প্রভু পাহাড়ের ওপর অনেক মানুষের কঙ্কাল আছে ওদের জিজ্ঞেস করলে ওরা রাস্তা বলে দেবে। ওরা আমাকে বলেছিল, তাই আমি নেমে আসতে পেরেছিলাম।

মালিক বলল, তুই কে?

ছেলেটি জবাব দিল, আমি আপনার কর্মচারী। বুড়ী মায়ের গরীব ছেলে।

ওরে, আমায় রক্ষে কর, বাবা।—এই বলে মালিক হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

আকাশে তখন বাজপাখী উড়তে শুরু করেছে।

ছেলেটি হীরে জহরৎ পান্না বোঝাই করে উটের ওপর চড়ে বাড়ির পথে রওনা হল।

মালিক পড়ে রইল পাহাড়ে।

আকাশ জুড়ে অন্ধকার নেমে এলো।

দেবকন্যা ও কাঠুরিয়া

গ্রাম থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে জংগল। পাঁচ মাইল লম্বা আর তিন মাইল চওড়া নিবিড় জংগল। নানা ধরনেব মূল্যবান কাঠ আর সুন্দর সুন্দর পশুপক্ষীর ভিড় সেখানে। সূর্যের আলো যখন সকাল বেলায় উঁচু উঁচু গাছের সবুজ পাতার জাফরি ভেদ করে লাল মাটির ওপর এসে পড়ে, তখন জংগলের পথগুলিতে অদ্ভুত একটা মমতা মাখানো আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে। উঁচুতে চোখ মেলে তাকিয়ে কাঠুরিয়া বেলা ঠাওর করলো। তা প্রায় দুপুর হয়ে এলো। এবার ফেরার পালা। গাছ-কাটা ছোট ছোট কাঠের গুঁড়িগুলি সাজাতে সাজাতে আপন মনেই সে ভাবতে থাকে।

ত্রিসংসারে তার কেউ নেই। একমাত্র বুড়ী মা। আর নদীর ধারে গাঁয়ের শেষ সীমানায় ছোট্ট মাটির কুঁড়েখানি। একখানি খোপ যেন। কোন তক্তপোষ নেই। মেঝেতেই মা-ব্যাটার শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা কেটে যায়।

কাঠুরিয়ার জীবনে কখন যে কুড়িটা বসন্ত পার হয়ে গেছে তা সে বুঝতেই

পারে নি। কাঠ কাটা, কাঠ বেচা, আর দুটো দানা জোগাড় করতেই তার সময় কেটে গেছে। সব সময় কুঁড়ে খানার চাল ছাইতেও পারে না।

গাঁয়ের অন্যান্য যুবকরা নানারকম কাজকর্ম করে পয়সা রোজগার করে। তাদের সকলের একটা করে সুন্দরী বউ হয়েছে। সারাদিনের কাজ শেষে যখন তারা সন্ধ্যেবেলায় ফেরে। তখন তাদের বউরা সেবা করে। ওদের জীবনটা বেশ সুখের। আনন্দের।

কাঠুরিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

ওদের মায়েরা কত সুখী। বউ তাদের যত্নআত্তি করে। সময়মত রান্না করে দু মুঠো জোগাড় করে দেয়। বুড়ীরা ধীরে ধীরে খায়। বউয়ের সঙ্গে গল্প করে। হাসি ঠাট্টা করে। বেশ কেটে যায় ওদের জীবন।

কাঠুরিয়ার যেন দুঃখের শেষ নেই!

আসলে গরীব মানুষের জীবনটাই এ রকম।

নিজের মনেই কথাগুলো উচ্চারণ করতে করতে কাঠের গুড়িগুলি স্তূপীকৃত করতে থাকে।

এমন সময় হঠাৎ একটা গোলমালের শব্দ শোনা গেল। বনের মধ্যে দাপাদাপি ছুটোছুটি। কাঠুরিয়া কাজ থামালো। দেখলো, জংগলের সরু পথ বেয়ে একটি হরিণ পাঁই পাঁই করে ছুটে আসছে। নিশ্চয়ই পিছন থেকে কেউ না কেউ তাড়া করেছে। হরিণটি কাঠুরিয়ার সামনে এসে দাঁড়ালো। সে হাঁপাচ্ছিল। কোনরকমে বললো, ভাই, কাঠুরিয়া, তুমি আমাকে একটু আশ্রয় দাও; শিকারী আমার পেছন পেছন ধাওয়া করে আসছে। তুমি আমাকে বাঁচাও।

কাঠুরিয়া তাড়াতাড়ি কাঠের গুঁড়িগুলির পেছনে ওকে লুকোতে বলে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ওর সুন্দর শরীরটাকে একেবারে ঢেকে দিলো। বাইরে থেকে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। হরিণটাও নিশ্চিন্ত হলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এক শিকারী ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হলো কাঠুরিয়ার সামনে। হাঁপাতে হাঁপাতে সে জিজ্ঞেস করলে, এদিক দিয়ে একটা হরিণকে পালাতে দেখেছো?

কাঠুরিয়া চটপট জবাব দিলো, হ্যাঁ। দেখেছি। হরিণটি ভারী সুন্দর।

ছুটতে ছুটতে এসে ঐ শাল গাছটার কাছে খানিকক্ষণ দাঁড়ালো। তারপর ঐ পাহাড়ী চালের দিকে শন্ শন্ করে ছুটে পালালো।

আহাম্মক কোথাকার। ধরে রাখতে পারলে না!

এই কথা বলেই শিকারীটি আবার ছুটতে লাগলো ঐ পাহাড়ী চালের অভিমুখে।

কিছুক্ষণ পরে কাঠুরিয়া কাঠের গুঁড়িগুলি সরিয়ে হরিণটিকে মুক্ত করে দিলো। সে তখন বাইরে এসে বাতাসে খানিকটা সুস্থ বোধ করতে লাগলো।

হরিণটি তাকে বললো, ভাই, কাঠুরিয়া, তুমি আমার মস্ত উপকার করেছো। আমি কোনদিন তোমার উপকার ভুলতে পারব না। আমি তোমার কাছে চির কৃতজ্ঞ। আমি জানি তুমি খুবই গরীব। আমি তোমার উপকার করতে চাই। তোমার গরীবী ঘোচাতে চাই। আমি যা বলি মন দিয়ে শোনো :—

হীরক পাহাড়ের ওপরে দুই চূড়োর মাঝখানে একটি সুন্দর আর ছোট্ট দহ আছে। দহের চারপাশ ঘিরে আছে নানারকমের গাছ। তাতে ফুটে থাকে নানান রঙের ফুল। কী সুগন্ধ তাদের। আর মাটির ওপর সবুজ মসৃণ ঘাসের বিছানা। দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে। মন ভরে যাবে।

ঠিক সূর্যাস্তের সময় তোমাকে পৌঁছতে হবে ঝোপের আড়ালে তুমি লুকিয়ে থাকবে। দেখো, কেউ যেন আবার তোমাকে না দেখে ফেলে।

তারপর ধীরে ধীরে রাত নেমে আসবে। শুনতে পাবে অনেকগুলি মানুষের ফিসফিসানি। কিন্তু কোন কারণেই তুমি আড়াল থেকে বেরিয়ে আসবে না।

যখন রাত গভীর হয়ে আসবে তখন আকাশের ওপর সাত রঙের ঢেউয়ের খেলা শুরু হবে। সাত রঙের ঢেউ নাচতে নাচতে তৈরী করবে একটি রামধনু। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সেটা ছড়িয়ে থাকবে। তখন তুমি অবাক হয়ে দেখবে ঐ সাতরঙা রামধনুর ওপর আটজন সুন্দরী মেয়ে বসে আছে। তাদের রূপের বন্যায় চারিদিকে প্লাবিত। ওরা স্বর্গ থেকে নেমে আসে প্রতি রাতে। পরণে দামী ঝলমলে পোশাক। গায়ে রত্ন আভরণ।

ওরা স্বর্গ থেকে নেমে আসে দহের শীতল জলে শরীর জুড়োতে। দামী পোষাক আর রত্ন খচিত গয়না খুলে ওরা ঝাঁপ দেয় দহের জলে। মাছের মত তির্ তির্ করে সাঁতার কাটে। জলের মধ্যে সাঁতার কাটতে কাটতে নানারকম শব্দ তোলে। হাসি ঠাট্টা করে। তারপর শরীর জুড়িয়ে গেলে ওরা দহের

জল থেকে উঠে এসে দামী পোশাক পরে। গয়না পরে তারপর আবার রামধনুর রথে চড়ে স্বর্গে চলে যায়।

তুমি ঝোপের আড়াল থেকে ঐ আটজন মেয়েকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে। তারপর ঠিক করবে, কাকে তোমার বেশী পছন্দ। যাকে তোমার বেশী পছন্দ তাকেই তোমাকে বিয়ে করতে হবে। কেমন?

কাঠুরিয়া তো অবাক। সে হরিণকে বললো, আমি একজন গরীব কাঠুরিয়া। আমি বিয়ে করবো স্বর্গের অপ্সরাকে। আমি যে স্বপ্নেও এসব কথা ভাবতে পারি না।

হরিণ ওর কথায় খানিকটা বিরক্ত হলো। বললো, আমি যা বলছি তাই শোনো। তুমি আড়াল থেকে দেখবে ওরা পোশাকপত্তর এবং গয়নাগুলি কোথায় রাখে। তারপর যে মেয়েটিকে তোমার সবচেয়ে পছন্দ তার পোশাক আর গয়নাপত্তর লুকিয়ে রাখবে। ওরা সবাই দহের জল থেকে উঠে পোষাক-পত্তর পরবে, গয়না পরবে আবার স্বর্গে চলে যাবে। শুধু তুমি যার পোশাক আর গয়না লুকিয়ে রাখবে সেই ফিরতে পারবে না। সঙ্গীরা চলে যাবার পর সে যখন সম্পূর্ণ একা থাকবে তখন তুমি তার কাছে আসবে। তাকে বলবে, আমি তোমাকে পরণের কাপড় আর গয়না দেবো। আমাকে তোমায় বিয়ে করতে হবে। তারপর বিয়ে হয়ে গেলে আর তোমার দারিদ্র্য থাকবে না। দুশ্চিন্তা থাকবে না। তুমি পরম সুখে আর অনেন্দে থাকতে পারবে।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে। তুমি যেন ভুলেও কখনও তোমার বউকে স্বর্গের সেই দামী পোষাক আর গয়না দেখিও না। তাহলে আবার তোমার দুঃখ ফিরে আসবে। যতদিন না তোমার চারটি সন্তান হচ্ছে ততদিন তুমি সেগুলি অতি যত্নে গোপন করে রাখবে।

কাঠুরিয়া সব শোনার পর বললো, কিন্তু হরিণ ভাই, হীরক পাহাড়ের ওপর পৌছনোর সহজ রাস্তার কথা বলো।

হরিণ কাঠুরিয়ার কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে হীরক পাহাড়ে পৌছনোর সহজ রাস্তাটি বলে বিদায় নিলো।

বিদায় বন্ধু, তোমার কল্যাণ হোক!

এই বলে সেই হরিণ আবার গভীর জংগলে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

● ● ●

কাঠুরিয়া ফিরে এলো তার কুটিরে। উঠোনের একপাশে কাঠের বোঝাটি নামিয়ে পুকুর থেকে হাতমুখ ধুয়ে নিলো। সামান্য কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়লো মেঝের ওপর। চোখ দুটো বন্ধ করে পড়ে। রইলো। ঘুম তার আসে না কেবলই মনে পড়ে হরিণের কথা, হীরক পাহাড়ের কথা, রামধনু আর সেই আট মেয়ের কথা। তাদের একজনের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। তার দুঃখ ঘুচে যাবে, সে খুব আরামে থাকবে।

এসব কি সত্যি! গরীব কাঠুরিয়ার জীবনে এই স্বপ্ন কখনও সত্যি হয়ে উঠবে? নাকি হরিণের সঙ্গে কথা বলাটাই স্বপ্ন।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে কখন রাত কেটে গেছে। ভোরবেলাকার সূর্যের আলো এসে ঢুকে পড়েছে তার উঠোনে আর ঘরে। ঘুম থেকে উঠে সে স্নান সেরে নিলো। তারপর যাকে কোন কথা না জানিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো হীরক পাহাড়ের সন্ধানে। সারাদিন ধরে হাঁটতে হাঁটতে এসে হাজির হলো হীরক পাহাড়ের কাছে।

সামনে উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের পাদদেশে জংগল। পথ পাওয়া মুস্কিল। জংগলের মধ্যে যে ঢুকে পড়লো। বেশ খানিক যাবার পরই সে পাহাড়ে চড়ার পথ পেয়ে গেলো। ক্রমে সে পাহাড়ের অনেকখানি ওপরে উঠে এলো। দেখতে পেলো সেই আশ্চর্য দহ। নীল তার জল। দুপাশে খানিক দূরে দূরে অবস্থিত দুটি চূড়ো। তাদের মাথায় সাদা ঝকঝকে টুপি। তুষারের তৈরী। দহের চারপাশে ঘন গাছপালা নানারংয়ের ফুল ফুটে আছে। কী সুবাস তাদের। সারা জায়গাটা ম ম করছে। কাঠুরিয়া চারিদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলো। কী অপূর্ব সৌন্দর্য! স্বর্গীয় পরিবেশ! কাঠুরিয়ার দু চোখ আনন্দে ভরে যায়।

দিবা অবসান ঘটে। সূর্য পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে পশ্চিম আকাশে চলে পড়ে। কাঠুরিয়া ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নেয়। দেখতে দেখতে রাত্রি নেমে আসে। আঁধার গভীর আর ব্যাপ্ত। পাখীর কূজন বহুক্ষণ থেমে গেছে।

ালের শব্দ শোনা যায় না। একটা থমথমে ভাব। কাঠুরিয়া অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে।

এমন সময় হঠাৎ আকাশ জুড়ে সাতরঙের খেলা শুরু হয়ে যায়। আলোর ঢেউ। যেন আকাশ সাগরে আলোর ঢেউ এর মাতামাতি। হুড়োহুড়ি। কান শব্দ নেই।

সহসা আলোর ঢেউ থেমে গিয়ে সাত রঙের সেতু তৈরী হয়ে যায়। আকাশের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত তার বিস্তার। আর তার ওপর—

কাঠুরিয়া অবাক হয়ে দেখতে থাকে। চোখ দুটোর আকার বড়ো হয়। কী আনন্দ আর বিস্ময়। হরিণের কথা সত্যি। স্বপ্নও সত্যি!

কাঠুরিয়া দেখতে পেলো ঐ রামধনুর রথে স্বর্গের আটকুমারী নেমে এলো। সোনার মতো তাদের গায়ের রং। মাথায় বাদামী চুল। চোখের মণিগুলি আকাশের মতো নীল। পরনে দুধের গায়ের ওপর পুরা একটা দুধের জমাট সর ড়ে আছে।

ওদের কথা শোনা যাচ্ছে। ওরা ভারী পেল। গায়ে গায়ে চলে পড়ছে। ঠেলাঠেলি করছে। হাসাহাসি করছে। গান গাইছে।

দহের ধারে এসে দুধ-সাদা আবরণ খুলে ফেললো। আর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক একটা অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ওদের গায়ে কী সব দামী দামী পোশাক। পোশাকের ওপর পান্না, চুনি, মুক্তো আর সোনার কারুকার্য। গলায় হীরের খচিত হার ঝলমল করছিল।

কাঠুরিয়া অবাক হয়ে গিয়েছিলো।

স্বর্গের আটজন মেয়ে মূল্যবান পোশাক আর গয়না খুলে দহের জলে ঝাঁপ দিলো। নীলজলে বর সোনার দেহ সোনালী মাছের মতো ভেসে বেড়ালো খানিকক্ষণ। তারপর এক সময় জল থেকে উঠে পোশাক পরলো, গয়না পরলো, বাতাসে চুল শুকিয়ে নিলো। সব শেষে দুধ-সাদা আবরণ দিয়ে দামী পোশাক আর গয়না ঢেকে নিয়ে বসলো রামধনুর রথে।

আবার আকাশে উঠলো সাতরঙের ঢেউ।

ধীরে ধীরে আকাশের বুকের রঙের খেলা শেষ হয়ে গেলো।

নেমে এলো নিবিড় আঁধার।

তারপরই সূর্যোদয়।

কাঠুরিয়া যেন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। সকালের সূর্যের আলোয় স্নান সেরে সে বাড়ি ফিরলো। মাকে একটা কথাও সে বললো না। শুধু মনের ভেতরে একটা প্রশ্ন জাগলো। স্বর্গের এমন অপরূপ একটি মেয়ে তার ঘরের বউ হয়ে আসবে। তার কুঁড়েঘর রূপের ছটায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে······

এসব কি সম্ভব?

পরের দিন কাঠুরিয়া আবার এসে হাজির হলো। রাত গভীর হলে আকাশে রামধনুর সাতরং সাতটি ঢেউ এর মাথায় নিয়ে হাজির করলো আটজন সুন্দরী কন্যাকে। ওরা আলোর মতই হাসতে-হাসতে, গাইতে-গাইতে, পর স্পরের গায়ে ঢলাঢলি করতে করতে দহের কিনারে এসে দুধ সাদা আবরণ খুলে রাখলো। একে একে দামী পোশাক আর গয়নাও খুলে রাখলো। দহের নী স্বচ্ছ জলে গা ডুবিয়ে ভাসতে লাগলো মনের আনন্দে। মাথার ওপর নী আকাশে অসংখ্য তারার মালা। ঝক্‌ঝক্‌ করছে আকাশ।

কাঠুরিয়া ঝোপের আড়াল থেকে সব দেখলো। তারপর চারদিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে পা টিপে টিপে ঐ পোশাকগুলোর কাছে এলো। যে মেয়েটিকে তার সবচেয়ে পছন্দ হয়েছিলো, তারই পোশাক, গয়না আর আবরণ নিয়ে আবা সেই ঝোপের মধ্যে আশ্রয় নিলো।

খানিক পরে শীতল জলে স্নান সেরে রূপবতী কন্যারা একে একে উঠে এলে দহের জল থেকে। যে যার পোশাক, গয়না আর আবরণ পরে নিলে। শু একজনের কোন পোশাক নেই। কোনো আবরণ নেই। সে অনেক খুঁজলো কিন্তু কোথাও সন্ধান পেলো না। সঙ্গীরা ওর পোশাক খুঁজলো না। ও জন্যে অপেক্ষাও করলো না। সাত রঙের ঢেউয়ের মাথায় চড়ে সাত রূপব কন্যা আকাশ-সীমানা পার হয়ে দূরে মিলিয়ে গেলো।

নীল আকাশের নীচে জলের ধারে বসে রূপবতী কন্যা অঝোরে কাঁদ লাগলো। এই নির্জনতা তার দুঃখকে আর নিবিড় করলো।

কাঠুরিয়া অতি সন্তর্পণে গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে ডাক দিলো, ও রূপসী, তুমি একা একা এমন করে কাঁদছো কেন ?

আড়ষ্ট হয়ে মেয়েটি জবাব দিলো, আমার পোশাক চুরি গেছে।

আমি তোমার পোশাক দেব।

দাও।

একটি শর্তে দিতে পারি।

সেটা আবার কি ?

আমায় বিয়ে করতে হবে।

মেয়েটি বললো, আগে পোশাক দাও। পছন্দ হলে বিয়ে করবো।

কাঠুরিয়া তাকে অন্য একটি পোশাক দিলো। মেয়েটি সেটা পরে বললো, বেশ। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি বিয়ে করতে রাজী আছি।

কাঠুরিয়ার আনন্দ আর ধরে না। সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলো। মনের ভেতরকার বীণায় ঝংকার উঠলো। বাতাস ওর কানের কাছে গুনগুন করে গান করে গেলো। নীল আকাশের ঝলমলে তারার দল যেন ওকে আশীর্বাদ করলো। কাঠুরিয়া তাকিয়ে দেখলো মেয়েটির পানে। তার সারা মুখে রূপের বন্যা। গভীর কালো চোখে কাঠুরিয়া দেখতে পেলো তার সৌভাগ্য-কে। তাকে পরম আদরে নিয়ে এলো তাদের কুটিরে। কুটিরে পা দেওয়া মাত্র সেটা প্রাসাদে পরিণত হলো। সাদা, নীল আর গোলাপী পাথরে তৈরী সে বিশাল প্রাসাদ। বড় বড় থাম। প্রতিটি থামে নানারকমের লতা পাতা ফুল আঁকা। কোথাও কোন রাজসভার চিত্র। কোথাও নৃত্যশীলা কোনো অপ্সরা। সাদা মেঝের ওপর দিয়ে রূপবতী কন্যা যখন তার তুলতুলে পা দুটি ফেলে যায়, তখন তার সর্বাঙ্গের প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে পাথরের দর্পণে।

কাঠুরিয়া ভারী খুশি। তারও গায়ে দামী পোশাক। ঝলমলে আর রত্নখচিত। তার বুড়ী মায়ের গায়েও দামী পোশাক।

খাবার সুস্বাদু আর দামী।

কাঠুরিয়া আর তার বউ খেলো। কাঠুরিয়ার বুড়ীমা সে সব খাবার খেয়ে খুশীতে ফেটে পড়তে লাগলো।

কাঠুরিয়ার দুঃখের সংসারে এলো সুখের জোয়ার।

দেখতে দেখতে রূপবতী কন্যার কোল জুড়ে এলো ফুটফুটে একটি সন্তান।

কাঠুরিয়ার আনন্দ আর ধরে না।

এখন আর তাকে কাঠ কাটতে বনের মধ্যে যেতে হয় না। দুটো পয়সা রোজগারের জন্য কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে হাটে বেরোতে হয় না। দুমুঠো অন্নের অভাবে কলসীর জল গড়িয়ে ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে খালি গায়ে মেঝের ওপর শুয়ে রাত কাটাতে হয় না।

এখন দিন বদলেছে। সোনার চাঁদ ছেলেটিকে নিয়ে সে কতভাবে আদর করে, চুমো খায়, কত নামে ডাকে। এ সব করতেই তার দিন কেটে যায়।

রূপবতী কন্যাও তার কাঠুরিয়া স্বামী পেয়ে খুশি।

দিনে দিনে শিশুটি বড় হয়। বাবা মার কোল ছেড়ে হাঁটতে শেখে, আপন মনে সে হাতে তালি দেয়, নাচে, আধো আধো কথা বলে। আনন্দের স্বর্গ রচনা করে।

রূপবতীর আবার সন্তান আসে।

বুড়ী শাশুড়ি আনন্দিত হয়।

পরের পর রূপবতীর আরও একটি সন্তান হয়।

এখন তার সংসার ভারী। তিন সন্তানের জননী সে। কাঠুরিয়ার মনের মানুষ। কাঠুরিয়া তাকে বুকের মাঝে রাখে।

একদিন গভীর রাতে রূপবতী কাঠুরিয়ার পাশে শুয়ে মিষ্টি স্বরে অনুরোধ করলো হ্যাঁ গো, আজ কতদিন হলো বলো তো, সেই দহের জলে স্নান করি নি?

তা বছর পাঁচেক হবে।

আমার এখনও ইচ্ছা করে সেই দুই চূড়ো পাহাড়ের মাঝখানে নীল জলে গা ভাসিয়ে থাকি। তুমিও থাকবে আমার সঙ্গে। সে আমার নতুন অভিজ্ঞতা হবে

বেশ তো, কবে যাবে তাই বলো।

যাবো আর কি করে? রূপবতীর মনটা খারাপ হয়ে যায়। আমার সেই দুধ সাদা আবরণ নেই, অমন পোশাক নেই, অমন গয়না নেই—সেই যে হারালো, আজও তার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

কাঠুরিয়া চুপ করে রইলো।

রূপবতী বললো, তুমি আমাকে একটুও ভালোবাসো না!

কাঠুরিয়া মুখটা নীচু করে জবাব দিলো, এটা ঠিক নয়। তোমাকে আমি কতখানি ভালোবাসি সে কথা মুখে নাই বা বললাম।

রূপবতী কাঠুরিয়ার কাছ ঘেঁষে বসে বললো, আমি পোশাক চাই না। শুধু একবার চোখ মেলে দেখতে চাই। তাও তুমি দেখাতে পারো না?

কাঠুরিয়া বোঝাতে চেষ্টা করে। সে ওই পোশাকের কথা জানেই না।

রূপবতী বললো, ঐ দহের কাছে আর কোন মানুষই তো ছিল না। কেমন করে যে সেদিন আমার পোশাকগুলো হারিয়ে গেলো আজও তার কারণ খুঁজে পাই না। এটা আমার কাছে একটা আশ্চর্য ঘটনা।

আর কিছু আশ্চর্য হয় নি।

হ্যাঁ! হয়েছে বৈকি। ঐ নিরালা জায়গায় গভীর রাতে তুমি বা কেমন করে আমার সামনে এসে হাজির হলে? সেটাও আমার মাথায় ঢোকেনি। তবে আজ আমার মনে স্থির বিশ্বাস তোমার সঙ্গে আমার বিয়েটা ভাগ্যের লিখন।

কাঠুরিয়া মাথা নাড়লো। মনে মনে ভাবলো, কথাটা সত্যি। ভাগ্যের লিখন বলেই তো এমন হলো। নইলে গরীব কাঠুরিয়ার ভাগ্যে স্বর্গের রূপবতী বউ মেলে? এমন অগাধ সম্পত্তি মেলে? ভাগ্য যখন সুপ্রন্ন তখন ওর সঙ্গে মিথ্যা আচরণ করা ঠিক হবে না। যতই হোক সে ওর স্ত্রী। ওর তিন তিনটি সন্তানের জননী!

কাঠুরিয়া মনে মনে ওর ওপর খুশী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

খানিক পরে সে ফিরে এলো। হাত দুটি তার পিছনে।

সে বললো, চোখ বন্ধ কর। তোমাকে একটা আশ্চর্য জিনিষ দেখাবো।

রূপবতী চোখ বন্ধ বরলো। কাঠুরিয়া বললো, এবার খোলো।

রূপবতী চোখ খুলে দেখতে পেলো, কাঠুরিয়ার হাতে তার সেই দুধসাদা আবরণ।

রূপবতী স্থির দৃষ্টিতে দেখলো। কিছু বললো না।

কাঠুরিয়া বললো, একবার পরবে?

রূপবতী মিষ্টি হেসে জবাব দিলো, না। ওটা তুমি রেখে দাও।

কাঠুরিয়া আশ্চর্য হয়ে তাকালো ওর দিকে। এতদিন পরে কাছে পেয়েও সে ওটা পরতে চাইলো না! মুখে কিছু বললো না। আবররণটি নিয়ে চলে গেল।

দিন দুয়েক পরের ঘটনা। কাঠুরিয়া তখন বড়ো ছেলেকে কাছে বসিয়ে তার কাছে থেকে আধো আধো স্বরের কথা শুনছিলো। এমন সময় হঠাৎ তার চোখে পড়লো রূপবতী সেই পোশাক, গয়না আর সেই দুধ-সাদা আবরণ পরে তার দিকে এগিয়ে আসছে। কাঠুরিয়া অবাক। রূপবতী তার বড়ো ছেলেটিকে চুমো খেয়ে কোলে নিলো।

কাঠুরিয়া অবাক হয়ে দেখতে লাগলো আশ্চর্য দৃশ্য। আকাশ জুড়ে সাত রঙের ঢেউ আসছে—ক্রমে নীচে নেমে আসছে যেন—রূপবতী তার তিন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বসলো সেই রঙীন ঢেউগুলির মাথায়।

কাঠুরিয়া হায় হায় করে উঠলো। রূপবতী তারদিকে তাকিয়ে নরম আর সুন্দর একটি হাত তুলে ইশারা করলো সে চলে যাচ্ছে। আর হয়ত কোনদিন তার সঙ্গে দেখা হবে না। কাঠুরিয়া চেয়ে দেখলো। রূপবতীর জন্য তার চোখ বেয়ে জল পড়লো।

ধীরে ধীরে আকাশের বুক থেকে সাত রঙের ঢেউ মুছে গেলো। বৃষ্টিস্নাত নির্মলতা এলো আকাশের নীলিমায়। কাঠুরিয়া অবাক হয়ে গেলো—চোখের সামনে থেকে ওর প্রাসাদ কোথায় উড়ে গেলো। আর আশ্চর্য হলো, তার গা থেকে দামী পোশাক কোথায় চলে গেছে। ওর বুড়ীমা লাঠিতে ভর করে এসে ওর সামনে দাঁড়ালো। ছেলেকে বললো, খোকা, আজ জংগলে যাবি না? জ্বালানী কাঠ সব ফুরিয়ে গেছে।

কাঠুরিয়া হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো।

স্বপ্ন দেখে মানুষের সুখ হয়। স্বপ্ন ভাঙলে কাঁদে। কিন্তু কাঠুরিয়ার জীবনের এই সংসারও স্বপ্ন? মায়া! রূপবতী কি মায়াবিনী? তার সংসার করা এসব কি খেলা? অভিনয়?

কাঠুরিয়া রূপবতীর এভাবে চলে যাওয়াটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। কুঠার হাতে নিয়ে সে আবার বনের মধ্যে এসে হাজির হলো। কাঠ কাটতে কাটতে দুপুর গড়িয়ে এলো। ক্লান্তিতে বসে পড়লো সে। আপন আপন মনেই বলতে লাগলো, হরিণ ভাই, আমার মস্ত ভুল হয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারিনি রূপবতী আমাকে এমন করে ফাঁকি দিয়ে যাবে। তুমি এর একটা বিহিত করো।

সঙ্গে সঙ্গে সেই হরিণটি এসে হাজির হলো তার সামনে। তারও চোখের কোণে জল। কাঠুরিয়াকে তিরস্কার করে বললো, তোমাকে তো আমি আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলাম। রূপবতীর চারটি সন্তান না হওয়া পর্যন্ত ঐ পোশাক আর আবরণ দেখাবে না। এখন আমি কি করবো।

এই বলে হরিণ মুখ ফেরালো।

কাঠুরিয়া কেঁদে ফেললো। হরিণকে কাকুতি মিনতি করে বোঝাতে লাগলো, যে করেই হোক—একটা ব্যবস্থা তোমাকে করতেই হবে।

হরিণ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, তোমাকে আবার সেই হীরক পাহাড়ে যেতে হবে। সেই দহের ধারে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে হবে।

রূপবতী সেখানেই আসবে বুঝি? কাঠুরিয়া প্রশ্ন করলো।

না। রূপবতী সেখানে আসবে না।

কাঠুরিয়া বিমর্ষ হলো।

হরিণ আরও বললে, সেই দহের জলে স্নান করতে আর কেউ আসে না। তাই রামধনুর রথ প্রতি রাত্রে একটি বিশাল কলসী নামিয়ে দেয় দহের জলে। একটা দীর্ঘ সোনার শিকলে সে কলসী বাঁধা থাকে। সেই মাত্র কলসীটি জলে ভরে যাবে, অমনি তোমাকে ঝাঁপ দিয়ে ঐ সোনার শিকল ধরে ঝুলে পড়তে

হবে। কলসী আর তুমি ঐ শিকলের টানে পৌছে যাবে দেবলোকে। সেখানেই তুমি দেখতে পাবে তোমার রূপবতীকে।

এই কথা বলেই হরিণ অন্তর্ধান করলো।

কাঠুরিয়াও বাড়ি ফিরলো কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে।

পরের দিন কাঠুরিয়া হরিণের কথা মতো সেই হীরক পাহাড়ের নীলদহের কাছে উপস্থিত হলো। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইলো। রাত গভীর হলে হঠাৎ রামধনুর সাতরঙা ঢেউ উঠলো আকাশে। আর সেই ঢেউ এর মধ্যে একটি সোনার শিকল নেমে এলো। শিকলের মুখে একখানি সোনার কলসী। বিশাল তার আয়তন। কলসীর সারাগায়ে নানারঙের কারুকার্য।

কলসীটি ধীরে ধীরে নামলো দহের জলে। ভক্ ভক্ শব্দ উঠতে লাগলো কিছুক্ষণের মধ্যেই কলসী ভরে উঠলো। আর অমনি সেই কাঠুরিয়া ঝাঁপ দিলো দহের শীতল জলে। ধরে ফেললো সেই সোনার শিকল। কলসী ওপরে উঠতে লাগলো, কাঠুরিয়াও ওপরে উঠতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে এসে পৌছলো দেবপুরীতে।

পুরীর দ্বারে দিব্যকান্তি প্রহরী। পথরোধ করে দাঁড়ালো তার। প্রশ্ন করলো, এখানে মর্ত্যলোকের মানবের কোন প্রবেশাধিকার নেই। তুমি ফিরে যাও।

কাঠুরিয়া বললো, আমি মর্ত্যলোক থেকে দেবরাজের কাছে দেখা করতে এসেছি। আমার অভিযোগ আছে।

প্রহরী তার কথায় বিশ্বাস করতে পারছিলো না। অন্য প্রহরী এলে তাকে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে কিনা তার অনুমতি চেয়ে পাঠানো হলো। খানিক পরে দেবরাজের নির্দেশে তাকে প্রবেশ করতে দেওয়া হলো দেবরাজের সামনে।

দেবরাজ সিংহাসনে বসে আছেন। তার পাশে দেবজায়া। অপরপাশে একটি অপূর্ব লাবণ্যময়ী রমণী। রমণীর কোলের কাছে দাঁড়িয়ে তিনটি অপূর্ব বালক।

কাঠুরিয়া বিস্মিত চোখে দেখতে লাগলো। এতো তারই সন্তান। ঐ

রমণী তারই স্ত্রী রূপবতী। সাগ্রহে এগিয়ে গেলো কাঠুরিয়া। রূপবতী দেবরাজকে বললো, বাবা, এই ব্যক্তিই আমার সোয়ামী। এরই সন্তান এরা।

দেবরাজ কাঠুরিয়াকে স্বীকৃতি দিলেন এবং দেবপুরীতে সস্ত্রীক বসবাসের অনুমতি দিলেন। কাঠুরিয়া আবার ফিরে পেলো তার স্ত্রী রূপবতীকে আর তার প্রিয় তিন সন্তানকে। মর্ত্যে পড়ে রইলো সেই বুড়ী মা। তাকে দেখার কেউ রইলো না।

কাঠুরিয়া সুখেই দেবলোকে দিন কাটাতে লাগলো।

কিন্তু বিধাতার লিখন বোধ হয় উল্টো কথাই বলে। জীবন যেন ছকে বাঁধা চলে না। খানা খন্দ, চড়াই-উৎরাই, উত্থান·পতন—জীবনের বিচিত্র পথ। চলাটাই যেন জীবন। সুখ আসে সোনার আলোর মতো, আবার কখন দুঃখের অমাবস্যা এসে হাজির হয়।

কাঠুরিয়ার জীবনে এখন সুখের আলো। কিন্তু সে আলোও তার সম্পূর্ণ মনে হয় না। রূপবতী, তিন সন্তান, আর অফুরন্ত সম্পদ নিয়েও কাঠুরিয়ার মনে সুখ নেই। শান্তি নেই। রূপবতী তার মুখের দিকে চাইতে পারে না। বার বার সে জানতে চায়, কোথায় তার দুঃখ। তার কীসের অভাব। কাঠুরিয়া মনের কথা প্রকাশ করতে চায় না।

একদিন রূপবতী নির্জনে বসে জানতে পারে তার কথা। কাঠুরিয়া দীর্ঘদিন তার মাকে দেখেনি। তাই তার মনে ভীষণ কষ্ট। সে কথা কাউকে বলতে পাবে না।

রূপবতীর মনটা ভেঙে যায়। দেবপুরীতে ওদের বিষণ্ণ দেখে দেবরাজ তার কারণ জানতে চাইলেন তখন কাঠুরিয়া রূপবতীকে তার মনোবাসনা জানালো। রূপবতী সে কথা শুনে বিষণ্ণ হয়ে বললো, তোমার মনের ব্যথা আমি বুঝলাম। কিন্তু একটা অসুবিধা আছে। তুমি যদি মাকে দেখতে যাও, তাহলে আর এখানে ফেরার কোন উপায় থাকবে না। আমরা চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো।

কিন্তু রূপবতী মায়ের কথা একবার ভাবো। আমি সন্তান হয়ে তার কোন খবর রাখতে পারছি না, এটা কি দুঃখের নয়!

রূপবতী কাঠুরিয়ার কথা বুঝলো। তার বুড়ী মায়ের দুঃখে তার দুঃখ হলো। সে বললো, বেশ আমি বাবার সঙ্গে কথা বলে দেখি, কিভাবে তোমার যাবার ব্যবস্থা করা যায়।

দুদিন পরে রূপবতী কাঠুরিয়াকে সুসংবাদ জানালো, বাবা, তোমার যাবার জন্যে একটা ব্যবস্থা করেছেন। একটি বিশেষ ঘোড়ায় তুমি যাবে। মায়ের সঙ্গে কথা বলে, তাকে প্রচুর জিনিসপত্র দিয়ে আবার ঐ ঘোড়ায় তুমি ফিরে আসতে পারবে। তবে একটা ব্যাপারে তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে। কোন কারণে ভূল হয়ে গেলে আর তুমি এখানে ফিরতে পারবে না।

কি ব্যাপার? জিজ্ঞাসা করলো কাঠুরিয়া।

রূপবতী বললো, যদি একবার তুমি মর্ত্যের মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়াও, তাহলে তুমি আর ফিরতে পারবে না।

কাঠুরিয়া বললো, বেশ, আমি খুব সাবধানে থাকবো।

পরের দিন একটি সুসজ্জিত ঘোড়া আনা হলো। দুধের মতো সাদা তার রঙ। চোখ দুটি নীল। বাদামী কেশার। আর পিঠের দুপাশে দুটি বড়ো উজ্জ্বল ডানা। কাঠুরিয়া তার ওপর চেপে বসলো। কিছু সম্পদ ও খাদ্য তার পিছনে চাপিয়ে দেওয়া হলো।

রূপবতী ও তার তিন ছেলে সামনে এসে দাঁড়ালো।

বিষণ্ণভাবে চোখের জলে ওরা কাঠুরিয়াকে বিদায় দিলো।

উড়ন্ত ঘোড়া কাঠুরিয়াকে সঙ্গে নিয়ে মর্ত্যের পথে রওনা হলো।

আকাশ পথে মেঘের পাহাড় পার হয়ে মর্ত্যের পাহাড় আর নদীর ওপর দিয়ে হাওয়ার বেগে উড়তে উড়তে ঘোড়াটি হাজির হলো বনের ধারে সেই জীর্ণ কুটিরের দরজায়। কাঠুরিয়া ঘোড়ার উপর থেকে ডাকলে, মা, আমি এসে গেছি। তুমি বাইরে এসো।

কাঠুরিয়ার মা ঘরের ভেতর থেকে লাঠিতে ভর করে বেরিয়ে এলো। বহুদিন পরে ছেলেকে দেখতে পেয়ে বুড়ীর চোখে আনন্দের স্রোত বইতে লাগলো। বুড়ী তার ছেলের কপালে চুমু খেলো। কাঠুরিয়া জিনিসপত্র গুলো ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে দিলো।

বুড়ী বললো, আয় বাবা, নেমে আয়। অনেকদিন পরে এলি, আমি তোর জন্য কিছু খাবার তৈরী করে দিই।

কাঠুরিয়া বললো, না, না, অপেক্ষা করার মত সময় হবে না। এখুনি আমাকে বিদায় নিতে হবে।

ছেলের কথায় বুড়ী হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো।

কাঠুরিয়া মায়ের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলো না। বললো: বেশ, খাবার রান্না করে আনো, আমি ঘোড়ার ওপর অপেক্ষা করছি।

বুড়ী ছেলের কথায় আশ্বস্ত হলো।

খানিক পরে একটি থালায় গরম খানিকটা তরল খাবার এনে ছেলের হাতে দিতে গেলো। কিন্তু ছেলের হাত থেকে পিছ্‌লে পড়ে গেলো থালাটি।

ঘোড়ার সামনের পায়ে গরম খাবারটি পড়ায় ঘোড়াটি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে করতে লাফ দিলো। কাঠুরিয়া এরূপ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলো না। ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়লো সে মাটিতে। অর অমনি সেই উড়ন্ত ঘোড়া উড়লো আকাশে—মেঘের ওপর দিয়ে পাখীর মত ভাসতে ভাসতে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল।

আর কাঠুরিয়া সেই ঘোড়ার চলার পথের দিকে উর্ধমুখে চেয়ে কাঁদতে লাগলো।

রূপবতী আর তিনছেলে আজও হয়ত দেবলোকে অপেক্ষা করে আছে কাঠুরিয়া পিতার জন্য।

আর মর্ত্যলোকের বিশ্বাস ঐ কাঠুরিয়া মোরগ হয়ে এখন ও ভোরের বেলায় আকাশের দিকে মুখ উঁচু করে ডাকে, কাঁদে—কোঁকর—কোঁ—ক।

হায় রূপবতী !

হায় সন্তান !

ভোরের বাতাসে কাঠুরিয়ার সেই বুকফাটা কান্না হয়ত ভাসতে ভাসতে মেঘের পাহাড় ডিঙিয়ে দেবলোকের দরজায় ঘা মারে।